বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০১৯ ▪ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

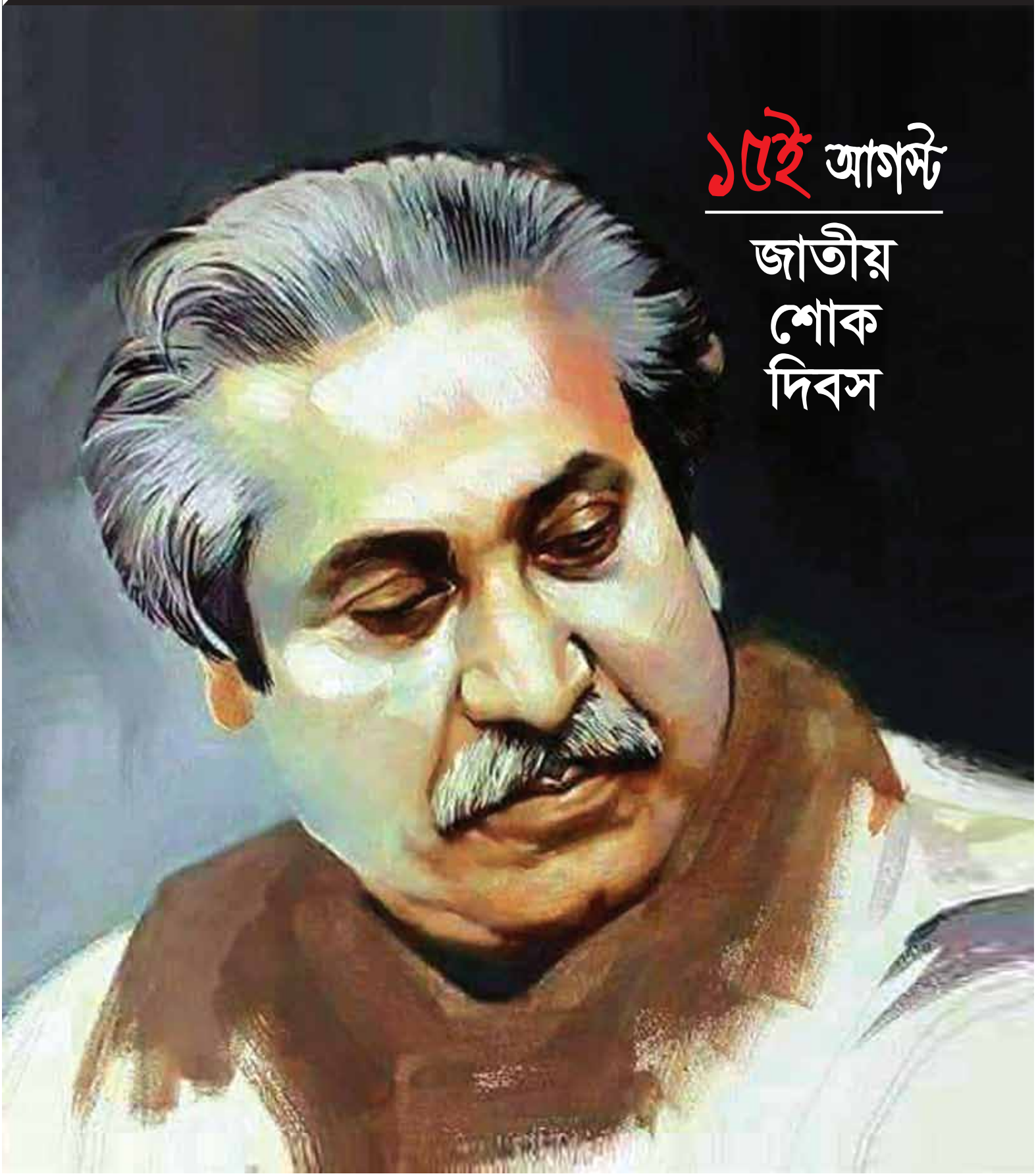

১৫ই আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

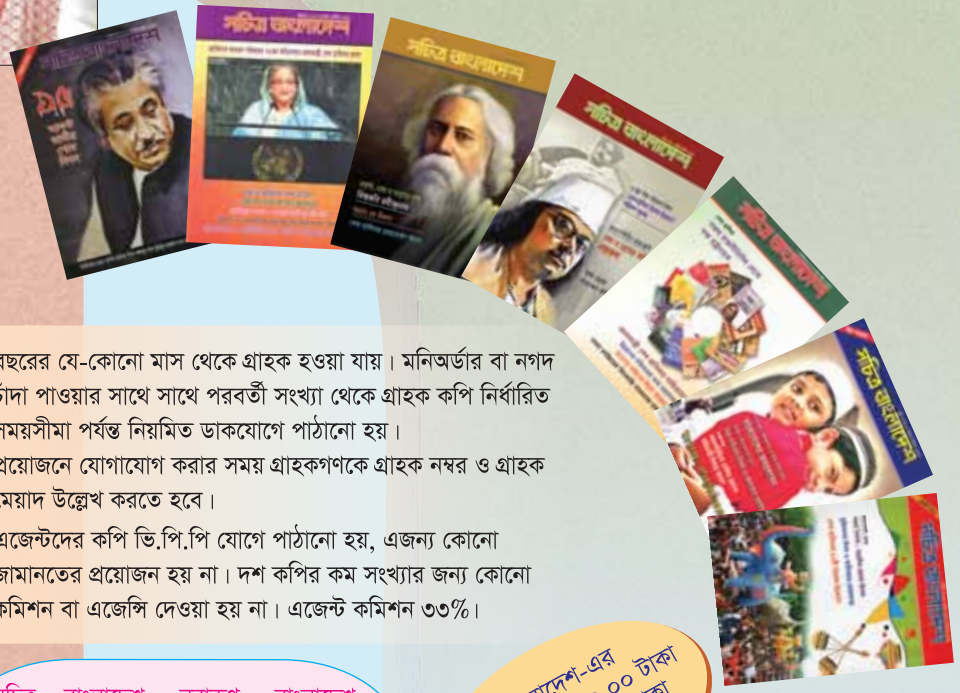

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর

জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ

[১৭ই মার্চ ২০২০ - ১৭ই মার্চ ২০২১]

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তাব আহ্বান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পাণ্ডুলিপিসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে। ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে আগ্রহী বাংলাদেশি নির্মাতাদের প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রস্তাবে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ :

- বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের গল্প, চিত্রনাট্য এবং নির্মাণের কর্মপরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিটি ৫ (পাঁচ) কপি করে জমা দিতে হবে।
- স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর পরিণত বয়সের কোন অভিনয় থাকবে না। তবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর পূর্বে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্র ব্যবহার করা যাবে।
- প্রস্তাব জমা দেওয়ার সময় প্রস্তাবক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, এনআইডি নম্বর প্রস্তাবের সাথে উল্লেখ করতে হবে।
- এ সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হতে পারবেন না।
- স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্রের প্রযোজক হবে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি"র পক্ষে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি।
- প্রতিটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি প্রামাণ্যচিত্রের জন্য সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।
- চূড়ান্তভাবে মনোনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের ব্যয়ভার সরকার বহন করবে।
- চিত্রনাট্য ও পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব "মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (১১২,সার্কিট হাউস রোড) ঢাকা"য় পাঠাতে হবে।

সদস্য সচিব
চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক,সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 02, August 2019, Tk. 25.00

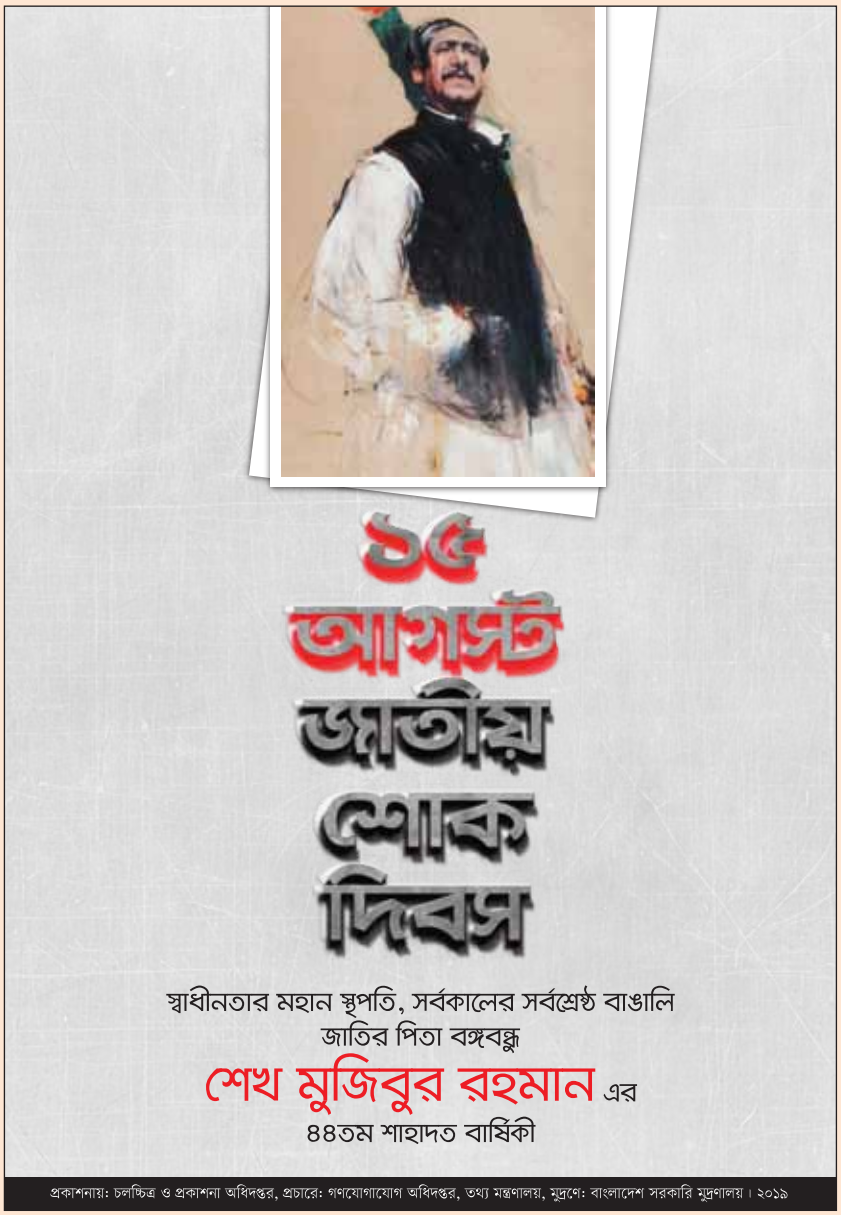

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

আগস্ট ২০১৯ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৬

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতিসৌধ

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন। ১৯৭৫ সালের রক্তঝরা শোকাবহ এই দিনটিতেই আবহমান বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসেবে দেশের কিছু বিপথগামী ঘৃণ্য নরঘাতক পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিল। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদদের। আমরা তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বজ্রকণ্ঠের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘদেহী পুরুষোচিত উপস্থিতি আর দেশ ও জনগণের জন্য বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে হয়ে উঠেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। তিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেন মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর সাহসী, দৃঢ় ও আপসহীন নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। একাত্তরের সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক ভাষণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর ঘাতকেরা সকল ক্ষেত্রেই মুক্তি বিপন্ন করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়, জাতি জেগে ওঠে। ঘাতকের বুলেটে ঝরা জাতির পিতার শোণিত থেকে বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে বঙ্গবন্ধুর চেতনাবাহী লক্ষ-কোটি উত্তরসুরি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে। দিন বদলের সনদ– ভিশন:২০২১-এর পথ ধরে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ* এবার প্রকাশ করছে বিশেষ সংখ্যা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্ট নিয়ে খ্যাতিমান শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও লেখকদের লেখা এবং কবিদের কবিতা নিয়ে সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে।

ঈদ-উল-আজহার কোরবানি বিষয়ে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মমতাজউদদীন আহমদ-এর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধসমূহ। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। আরো আছে গল্প ও কবিতাসহ নিয়মিত অন্যান্য প্রতিবেদন।

আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর বিশেষ সংখ্যাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সিনিয়র সম্পাদক
মো. জাহিদুল ইসলাম
সম্পাদক
মো. শরিফুল ইসলাম

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৪৯৩৫৭৯৩৬
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

আশৈশব জনতালগ্ন ৪
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

সপরিবারে কেন হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে ৫
অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন

মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা ৯
সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ: একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ ১০
ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু: যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ১২
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারা ১৪
ড. আব্দুস সামাদ

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির মণিকোঠায় ১৭
ড. মোহাম্মদ হাসান খান

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং শোক দিবস ১৯
বিনয় দত্ত

গণ-মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু ২১
মিনা মাশরাফী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেমন দেখেছি ২৪
মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ২৬
শামসুজ্জামান শামস

আগস্টের শোক শক্তিতে রূপান্তর হোক ৩০
বরুণ দাস

লোকান্তরিত মুজিব– শোক থেকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও জাতীয় মুক্তি ৩৩
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

বাঙালির রাজনীতি, শোক ও শক্তির সূতিকাগার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ৩৫
কে সি বি তপু

কোরবানির ঈদ: মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র সহায়ক হতে শেখায় ৩৮
খান চমন-ই-এলাহি

আধুনিক কৃষির রূপকার প্রজাবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৩
আলী হাসান

নজরুলের দেশাত্মবোধক জাগরণী গান ৪৪
মো. আলী হোসেন

স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মমতাজউদদীন আহমদ ৪৫
বাবুল আকতার

হাইলাইটস

গুজবে আতঙ্ক! আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ৪৬
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৯

মায়ের দুধের বিকল্প নেই ৪৯
মিতা খান

ডেঙ্গু জ্বরে সচেতন থাকুন ৫০
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

গল্প

ফিনকি ৪০
জয়া সূত্রধর

স্বপ্নের ঘরবাড়ি ৫৭
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৩২, ৪৮, ৫২-৫৬
খান আসাদুজ্জামান, নির্মলেন্দু গুণ, মাসুদুর রহমান দেলওয়ার বিন রশিদ, সাঈদ তপু, আবুল হোসেন আজাদ আতিক আজিজ, মোহাম্মদ ইলইয়াছ, শাহরুবা চৌধুরী মুহাম্মদ ইসমাঈল, বাবুল তালুকদার, জাহাঙ্গীর আলম জাহান এম এ ফরিদ, শিল্পী ভদ্র, রুমী ইসলাম, নাহার আহমেদ মোসলেম উদ্দীন, আহসানুল হক, নুসরাত হক অমিতাভ মীর, শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬০
প্রধানমন্ত্রী ৬১
তথ্যমন্ত্রী ৬২
জাতীয় ঘটনা ৬৩
উন্নয়ন ৬৪
আন্তর্জাতিক ৬৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৫
শিল্প-বাণিজ্য ৬৬
শিক্ষা ৬৭
বিনিয়োগ ৬৮
নারী ৬৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৭০
কৃষি ৭০
বিদ্যুৎ ৭১
কর্মসংস্থান ৭১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭২
নিরাপদ সড়ক ৭৩
যোগাযোগ ৭৩
স্বাস্থ্যকথা ৭৪
মাদক প্রতিরোধ ৭৫
সংস্কৃতি ৭৫
প্রতিবন্ধী ৭৬
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
চলচ্চিত্র ৭৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৮
ক্রীড়া ৭৮
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএফপি'র কার্যক্রম ৮০

আশৈশব জনতালগ্ন

বঙ্গবন্ধু নিজেকে জানতেন, বাঙালিকেও চিনতেন, শৈশব থেকে শুরু করে আজীবন তিনি এই বাঙালিলগ্ন রাজনীতিই করেছেন। শৈশবে বাবা-মার আদরের খোকা এই বাঙালিলগ্ন রাজনীতি করতে করতেই একদিন হয়ে ওঠে শেখ মুজিব, শেখ সাহেব এবং মুজিব ভাই। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত করেছে। বাঙালির জন্য এ ভালোবাসা ও আপোশহীন নেতৃত্বগুণেই আশৈশব জনতালগ্ন এই নেতা পরিণত হন বঙ্গবন্ধুতে। অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন রচিত 'আশৈশব জনতালগ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

সপরিবার কেন হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে

১৫ই আগস্টের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড কেন, কারা এবং কী কারণে ঘটিয়েছিল– সে বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সীমিত হলেও এ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পেছনে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল, তা সন্দেহাতীত। এ বিষয়ে বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্য জানার জন্য অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন রচিত 'সপরিবার কেন হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৫

মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও মৃত্যু– এই দুই সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। তিনি ছিলেন বলে আমরা স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জন পেয়েছি। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজ অবস্থান তৈরি করেছে। জাতির পিতাকে সামনে রেখে চলছে পথচলা। তিনি আছেন সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমানুষের চেতনায় প্রদীপ্ত আলোয়। বাংলা মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জাগরণের গান। শোক যে শক্তির উৎস হয়, বাংলাদেশ তার প্রমাণ। এ বিষয়ে সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচিত 'মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৯

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ: একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ

খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি বহুল পঠিত ও ব্যবহৃত। এই কবিতাটির শুদ্ধ পাঠ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কবিতাটির শুদ্ধ পাঠসহ অন্যান্য তথ্যের জন্য ড. মোহাম্মদ হাননান রচিত 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ : একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ' প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-১০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

আশৈশব জনতালগ্ন

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

একবার নিজ এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু একটি অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধটি ছিল এমন – 'আমি মরে গেলে তোরা আমাকে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দিবি। আমার কবরের ওপর একটি টিনের চোঙা লাগিয়ে দিবি।' একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'টুঙ্গিপাড়ায় আপনার কবরের কথাটি না হয় বুঝলাম, টুঙ্গিপাড়া আপনার জন্মস্থান। কিন্তু এই চোঙা লাগানোর ব্যাপারটি তো বুঝলাম না।'

টুঙ্গিপাড়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'টুঙ্গিপাড়ায় শুয়ে আমি পাখির ডাক শুনব, ধানের সোঁদা গন্ধ পাব। আর চোঙা লাগাতে বলছি এজন্য যে, এই চোঙা ফুঁকে একদিন শেখ মুজিব নামের এক কিশোর 'বাঙালি' 'বাঙালি' বলতে বলতে রাজনীতি শুরু করেছিল।' বঙ্গবন্ধু নিজেকে জানতেন, বাঙালিকেও চিনতেন, শৈশব থেকে শুরু করে আজীবন তিনি এই বাঙালিলগ্ন রাজনীতিই করেছেন। শৈশবে বাবা-মার আদরের খোকা এই বাঙালিলগ্ন রাজনীতি করতে করতেই একদিন হয়ে ওঠে শেখ মুজিব, শেখ সাহেব এবং মুজিব ভাই। তারপর সময় গড়িয়ে উনসত্তরের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির দেওয়া অভিধায় হলেন 'বঙ্গবন্ধু'। তারপর ঘটে গেল বাঙালির জীবনে এক বিরাট পর্বান্তর। বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রীয় সত্তায় ভূষিত হলো, যার অনুঘটক হলেন এই বঙ্গবন্ধু। কাজেই তিনি আর শুধু বঙ্গবন্ধু রইলেন না হয়ে উঠলেন জাতির পিতা। বাঙালি জাতির নির্মাণ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল, কিন্তু এই জাতির রাষ্ট্রীয় পরিচয়প্রাপ্তির জটিল ও কঠিন পরিক্রমায় অনুঘটক ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

কথায় বলে, উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়। বঙ্গবন্ধু তো তা-ই ছিলেন। তিনি যে নেতা হবেন, তাঁর নেতৃত্ব যে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো বাঁকবদলটি ঘটাবে– তার প্রমাণ কিশোর বঙ্গবন্ধুর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তখন গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। সঙ্গে আছেন শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুল পরিদর্শন শেষে তাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল খোকা শেখ মুজিব। সবাই হতবাক! শেরেবাংলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তার কী কথা?' উত্তর পেলেন, 'ছাত্রাবাসের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে বহুদিন থেকে। মেরামতের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তারা যেতে পারবেন।' শেরেবাংলা জিজ্ঞেস করলেন কত খরচ লাগবে? হিসাবটা শেখ মুজিব করে রেখেছিলেন। কাজেই উত্তর দিলেন ঝটপট– ১২শ টাকা। তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ বরাদ্দ হলো এবং এ কিশোরের সাহসিকতায় দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হলো। ভবিষ্যতে এ সাহস অবয়ব ও গভীরতায় অনেক বিস্তৃত হয়েছিল বলেই শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হয়েছিলেন।

একবার গোপালগঞ্জ এলাকায় বেশ খরা হয়েছিল। ক্ষেতে ফসল হয়নি। কৃষকের ভাগ্যও পুড়েছিল। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি কজন হতভাগ্য কৃষককে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তিনি প্রত্যেককে দিয়ে দিলেন কিছু ধান ও চাল। কাউকে কিছু না বলেই। বাবা বাড়ি ফিরে ব্যাপারটি জেনে খোকাকে কিছু গালমন্দ করলেন। কিন্তু খোকার বেশ দৃঢ় উত্তর ছিল– 'আমাদের তো ধান ও চাল ভালোই আছে, তা থেকে ওদের সামান্য দিলাম। কারণ ওদেরও পেট আছে, ওদেরও ক্ষিদে আছে।' দরিদ্র মানুষের প্রতি বা মানুষের প্রতি এই মমত্ববোধই জনতালগ্ন নেতার বড়ো গুণ। আর এই গুণই তাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিতে উন্নীত করেছে।

একবার একজন বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা কী?' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি।' এই ভালোবাসাই ছিল তার বড়ো গুণ। কিন্তু এই অন্ধ ভালোবাসাই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তাঁর জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তি মুজিব হারিয়ে গেলেও জনতার বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭২ সালে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বামে– বেগম ফজিলাতুন নেছা, শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে– শেখ রেহানা, শেখ কামাল এবং কোলে শেখ রাসেল।

সপরিবারে কেন হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন

'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পেছনে রহস্য নেই' লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় আবদুল গাফফার চৌধুরী, কিন্তু 'চক্রান্ত ছিল'। এই মন্তব্যের সত্যতা নিয়ে আজ আর দ্বিমত নেই। পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এর উদাহরণ। বিশেষ করে লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বিএনপির উত্থান তা প্রমাণ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যায় ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন কে? লে. জেনারেল জিয়া। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্র, পাকিস্তানপন্থি দলসমূহ। আন্তর্জাতিকভাবে সৌদি-পাকিস্তানি চক্র, আমেরিকা-চীন চক্র। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, যা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। পাকিস্তানের নির্দেশে ১৯৭১ সালে খুনিদের দলগুলোকে নিয়ে বিএনপির ভিত্তি তৈরি করেছিলেন যাতে আরো যোগ দেন দেশবিরোধী রেনিগেড কিছু রাজনীতিবিদ। জাসদের হঠাৎ উত্থান বিশেষ করে কর্নেল তাহের ও মেজর জলিলের পার্টির তাত্ত্বিক ও প্রধান হওয়াকে অনেকে মনে করেন এসব ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় ফ্রন্ট। আরেকটু পেছনের ইতিহাস দেখলে দেখব, ১৯৭১ সালেই মুক্তিযুদ্ধের সময় তরুণ নেতাদের অনেকের প্রকাশ্যে তাজউদ্দীন আহমদের বিরোধিতা, খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একাংশ ও আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র। অথচ বঙ্গবন্ধু তো ২৫শে মার্চের আগে চার ছাত্রনেতা ও অন্যান্য নেতাদের সব জানিয়ে দিয়েছিলেন। নেতা কাজী আরেফ শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিল:

১৮ই জানুয়ারি শেখ মুজিব সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে শেখ মনি ও তোফায়েলকে ডেকে নেন। আন্দোলন পূর্বাপর পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য পাকিস্তানি সামরিক শক্তির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি করে লড়াইয়ের উপযুক্ত ছাত্র-যুবশক্তি গড়ার কথা বলেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা চার যুবনেতা বা মুজিব বাহিনীর চার প্রধান।

এরপর ২১ তারিখেও একটি বৈঠক করেন এবং সেখানে তাজউদ্দীন আহমদকে উপস্থিত থাকতে বলেন। শেখ মুজিব যুবনেতাদের বলেন, 'আমি না থাকলেও তাজউদ্দীনকে নিয়ে তোমরা সব ব্যবস্থা করো। তোমাদের জন্য অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে।'

কাজী আরেফ আরো লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু কলকাতার একটি ঠিকানা দিয়ে তাদের বললেন, 'এই ঠিকানায় গেলেই তোমরা প্রবাসী সরকার, সশস্ত্র বাহিনী গঠন, ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্রে সহযোগিতা পাবে। নেতা বলেন, তোমরা চারজন সশস্ত্র যুবশক্তিকে পরিচালনা করবে। আর তাজউদ্দীন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব নেবে। তিনি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের কথা বারবার করে বলেন, বিপ্লবী কাউন্সিল প্রয়োজনে স্বাধীনতার পরও ৫ বছর থাকবে। তিনি কামারুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকেও এই কথাগুলো জানিয়ে রাখেন।'

২২শে মার্চ তিনি আবারো চার নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তোমরা ঐ হায়েনাদের সাতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তো? চার নেতা তাঁকে কথা দিয়েছিল।'

সুতরাং, অপরিণামদর্শী তিনি ছিলেন না। সবকিছুই ছকে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন জনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পারতপক্ষে একজনকে আরেকজনের কথা জানান নাই। বিপ্লবী দলের পরিকল্পনা যেভাবে ছক করা হয়, সেভাবেই সব ছকে ছিলেন। কাজী আরেফের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সুতারের বক্তব্যের মিল আছে।

চিত্তরঞ্জন সুতারের সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন শাহরিয়ার। সুতার তাঁকে জানিয়েছেন, '১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের সাহায্যের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য যে আলোচনা করেছিলেন সেখানে বিএলএফ নেতাদের সম্ভাব্য গেরিলা প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল'।

১৯৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারি বিষয়টি জানানো হয়েছিল তাজউদ্দীন আহমদকে। ২৫শে মার্চের আগে বঙ্গবন্ধু সুতারকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় দুটি বাড়ি ভাড়া করার জন্য যাতে সময় এলে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সেখানে জড়ো হয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যাক সে প্রসঙ্গ। জিয়া ও বিএনপি প্রসঙ্গে আসি।

১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকদের বিচার বন্ধ করতে ইনডেমনিটি জারি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক। আর জিয়াউর রহমান সেই অধ্যাদেশটিকে পঞ্চম সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ঘাতকদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পুরস্কার ও এনাম দানের পালা অব্যাহত ছিল। আরো কৌতূহলের বিষয় যে, খন্দকার মোশতাক ৫ই নভেম্বর ১৯৭৫ সালে এক গেজেট নোটিফিকেশনে জেলহত্যা তদন্তের জন্য তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন, জিয়াউর রহমান সেই তদন্ত কমিটি বাতিল করে দিয়েছিলেন। বিএনপি ও তার সহযোগীরা বারবার ১৫ই আগস্টকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলেও চালিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এটি যে সর্বৈব মিথ্যা, পরবর্তী ঘটনাবলিই তার সাক্ষী। সোহরাব হাসান যথার্থই লিখেছেন, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, আওয়ামী লীগই নাকি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিল। যদি সেটাই সত্য হয়ে থাকে জিয়াউর রহমানের দল কেন মুজিব হত্যার দায় কাঁধে নিচ্ছে? আওয়ামী লীগের যে অংশ ১৫ই আগস্ট চক্রান্তে জড়িত ছিল তারা এখন কোথায়? খন্দকার মোশতাক মারা গেলেও তার সব সহযোগী মারা যাননি। তারা কি আওয়ামী লীগ করছেন না অন্য পার্টি করছেন? ১৫ই আগস্টকে যারা 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করত তারাই বা কোন দলের, বিদেশে মুজিব হত্যাকারীদের পাসপোর্ট করে দিয়েছে কোন সরকার? (দৈনিক যুগান্তর : ১৫.৮.০৫)

১৫ই আগস্ট সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ বলেছেন, কিসিঞ্জার ও সিআইএ এ হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচিন্স একটি বই লিখেছেন, নাম *ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার*। হিচিন্স নথিপত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরের সময় মার্কিন দূতাবাসে বসেই ১৫ই আগস্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'গো এহেড' সিগনাল দেন।

ভারতের প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার দুমাস পরই লিখেছিলেন, 'বিশ্বের রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে মার্কিন ক্লায়েন্ট সরকার স্থাপন করতে হবে। মাধ্যম হবে ঘুষ, ব্ল্যাকমেইল ও হত্যা।'

কিসিঞ্জার যে বেইজিংয়ে মাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বা ঢাকাতে যে জঘন্য কাণ্ড ঘটেছে এটি সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরই হত্যাকারীরা যেভাবে সহজে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে আশ্রয় পেল, তা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে।

ইন্দিরা গান্ধী তখন ক্ষমতায়। তাঁর বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণ, জর্জ ফার্নান্দেজ প্রমুখ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তারা একে আখ্যায়িত করেছেন 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' বলে। ইন্দিরা গান্ধী সিপিআই নেতা ভুপেশ গুপ্তকে তখন বলেছিলেন, বিরোধীরা শুধু তাঁর মৃত্যু নয়, তাঁর সরকারের অর্জিত সব সুফলকেও ধ্বংস করতে চায় এবং এর পেছনে অভ্যন্তরীণ প্ররোচনা ছাড়া বহিঃশক্তির ইন্ধনও আছে।

ইন্দিরা গান্ধীর সেই অনুমান ভুল বলি কীভাবে, যখন দেখি 'বিপ্লবী' ফার্নান্দেজ মহানন্দে চরম গণবিরোধী বিজেপি সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

তৎকালীন কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মোহিত সেন লিখেছেন, সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের একটি চিঠি নিয়ে কুৎসোবিন এলেন দিল্লি। কুৎসোবিন সোভিয়েত পার্টির হয়ে ভারতীয় ডেস্ক দেখতেন। তিনি সিপিআই নেতৃবৃন্দের কাছে সেই চিঠি ও কিছু দলিলপত্র হস্তান্তর করেন। চিঠির একটি কপিও করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল পড়ার পর তা ধ্বংস করে ফেলতে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশ স্থাপনে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। উপমহাদেশের তৎকালীন সেই তিন নেতা হলেন– ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। মস্কো থেকে প্রেরিত সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রথম দুজন নেতাকে ইতোমধ্যে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানানো হয়েছে। সিপিআই নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তারা যেন প্রভাব খাটিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝান ষড়যন্ত্রের বিষয়টি হালকাভাবে না নিতে। কুৎসোবিন আরো জানিয়েছিলেন, ভুট্টোকে বিষয়টি সরাসরি জানানো হয়নি। কারণ, ভুট্টো কমিউনিস্টদের বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। বলে রাখা ভালো, ভুট্টো বিশ্বাস করতেন মার্কিনিদের। কিছুদিন পর মোহিত সেন জানিয়েছেন, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর স্বাক্ষর করা একটি চিঠি এল ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের কাছে। ক্যাস্ট্রো জানিয়েছিলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা মার্কিন ষড়যন্ত্র চলছে। কেউই গুরুত্ব সহকারে তা নেননি। মোহিত সেন অবশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি যুক্তরাষ্ট্রই ছিল এর হোতা। তবে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট সোভিয়েত এই ষড়যন্ত্র করেনি, করলে কুৎসোবিনকে দিল্লি পাঠানো হতো না। তাহলে বাকি থাকে আমেরিকা ও তার ক্লায়েন্ট স্টেট পাকিস্তান।

উপমহাদেশে সপরিবারে প্রথম নিহত হন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা। এতে ভুট্টো সহায়তা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। স্ট্যানলি ওলপোর্ট ভুট্টোর যে জীবনী লিখেছেন তাতে এর ইঙ্গিতও স্পষ্ট (প্রমাণসহ)। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বিশ্ব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো– এটি নিক্সন-কিসিঞ্জার মানতে পারেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল পাকিস্তানের জন্য চপেটাঘাত। এটি ভুট্টো ও পাকিস্তানের সামরিক এস্টাবলিশমেন্ট মেনে নিতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর পর ভুট্টোকেও যেতে হয়। মার্কিন তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা (দুই জিয়া) ক্ষমতায় আসে এবং মার্কিনি সাহায্যে এক দশক ক্ষমতায় থাকে। এর আগে একই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল চিলিতে। আলেন্দেকে হত্যা করে পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু কি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র জানতেন না? জানতেন। ভারত ও সোভিয়েত সূত্র থেকে তাকে তা জানানো হয়েছিল। সে আমলে বাংলাদেশে যারা গুরুত্বপূর্ণ আমলা ছিলেন (গোয়েন্দা বিভাগেও) তাদের কাছ থেকেও জেনেছি, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানানো হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেননি। তারা তখন তাঁকে ৩২ নম্বরের বাসভবন ছেড়ে গণভবনে এসে থাকার অনুরোধ করেছিলেন। তাতে তিনি খানিকটা সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু বেগম মুজিব ৩২ নম্বর ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় তিনি আর গণভবনে যেতে চাননি। তাছাড়া বিষয়টিকে তিনি হালকাভাবে নিয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে হয়নি কোনো বাঙালি তাঁকে খুন করতে পারে। কারণ তাঁর ভাষায়, 'আমি আমার দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তারা আমায় ভালোবাসে।' রবীন্দ্রনাথের ভক্ত শেখ মুজিব রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাও বিশ্বাস করেননি– '৭ কোটি মানুষকে বাঙালি করেছ... মানুষ করনি'।

বিএনপি আমলে এমনকি শেখ হাসিনার আমলেও সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিষয়ে বলা হতো এবং অনেক বিএনপি-জামায়াত অ্যাপলজিস্ট ও নিরপেক্ষরা বলতেন এবং বলেন, একদল বিপদগামী সেনা সদস্য শেখ মুজিবকে হত্যা করেছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রায় দুডজন সেনা কর্মকর্তার আত্মস্মৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তাই ফারুক রশীদদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন, এমনকি জিয়াউর রহমানও। কিন্তু কেউ বঙ্গবন্ধুকে জানাননি। [বিস্তারিত আমার লেখা *বাংলাদেশি জেনারেলদের মন*] ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার কাজ সম্পন্ন হয়ে রায় হয়েছে। এ বিচারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গত ৩৪ বছর বিএনপি ও পাকিস্তানপন্থিরা যে প্রচারণা চালিয়েছিল, তার মূল কথা ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা একটি তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। তাদের এ প্রচারণার লক্ষ্য ছিল ঘাতকদের রক্ষা এবং সমাজের সর্বস্তরে পাকিস্তানি ধ্যানধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে মামলায় যেসব নথিপত্র উত্থাপন করা হয়েছে তার আলোকে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু হত্যা, জাতীয় চারনেতা হত্যা ও সংবিধান পরিবর্তন এবং সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব অপনোদন– সব একসূত্রে গাঁথা। এসব ঘটনার পেছনে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গবন্ধু যে শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন তাতো নয়। তিনি ছিলেন একটি নতুন আদর্শের প্রতীক। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতা বিরোধী, তাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য এটি পছন্দ করেনি। মার্কিন ডিকটাই ও চীনাদের মার্কিন ও পাকিস্তান প্রীতিকে নস্যাৎ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি দেশ স্বাধীন করেছিল। এটি তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে সবচেয়ে বড়ো গণহত্যার বিষয়টি মার্কিন ও ইউরোপীয় বইপত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৃতিত্ব ছিল সশস্ত্রদের ওপর নিরস্ত্র বা সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যা সেই আমলের সেনা সদস্যদের পছন্দ হয়নি। তাদের ধারণা ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে। বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বাকশাল হলে কর্তৃত্ব হারাবে। এমনিতেও তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পাচ্ছিল। অতি বামরাও বঙ্গবন্ধুকে সরানোর জন্য ভুট্টোর সাহায্য চেয়েছিল এবং দেশেও বিপ্লবের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্ত মিলে তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার কারণ ছিল দুটি– এক. যেন তার পরিবারের কাউকে কেন্দ্র করে আবার সেই আদর্শ উজ্জীবিত না হয়, দুই. এমন আতঙ্ক সৃষ্টি যাতে কেউ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দাঁড়াতে না পারেন।

এ উদ্দেশ্য দুটির কোনোটিই সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার হয়েছে, তাদের পৃষ্ঠপোষক দল জামায়াত-বিএনপি হীনবল হয়েছে। কিন্তু তাতে কি সেই ষড়যন্ত্রের শেকড় উৎপাটিত হয়েছে? হয়নি। এবং সে কারণেই শেখ হাসিনাকে ২২ বার খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভেবে দেখুন পরাজিত পাকিস্তানপন্থিদের কাউকে একবারও হত্যার চেষ্টা করা হয়নি [এবং আমরা সমর্থনও করি না]। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু বা তাঁর আদর্শের শত্রুদের ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই।

বঙ্গবন্ধুর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু কেন, কারা এবং কী কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা হত্যা করল সে সম্পর্কে এখনো আমাদের জ্ঞান সীমিত। এ কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র উদঘাটনে একটি কমিশন হওয়া উচিত যাতে ষড়যন্ত্রকারীদের শেকড়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কেনেডি হত্যার পর যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ারেন কমিশন গঠিত হয়েছিল। সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে দেখেও আত্মতৃপ্তির কিছু নেই। ঐ রায়ের পরও দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র বিনাশ হবে বলে মনে করি না। এর সর্বশেষ উদাহরণ প্রিয়া সাহা। ষড়যন্ত্রকারীদের শেকড় অনেক গভীরে।

লেখক: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা

সেলিনা হোসেন

শোকের মাস যেন একটি কালো গোলাপ। এই মাসকে নিয়েই সৌরভ এবং রঙের সঙ্গে এক হয় গৌরব ও বেদনার ধারণা। গৌরব স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জন। আর শোক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়া। জীবন-মৃত্যুর দুই গভীর জায়গায় তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ানো অবিনাশী মানুষ। মৃত্যুর অবধারিত সত্য মেনে নিয়ে তিনি আমাদের সামনে অমরত্বের সাধনা।

এ দুটো সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। তিনি ছিলেন বলে আমরা স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জন পেয়েছি। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজ অবস্থান তৈরি করেছে। তাঁকে সামনে রেখে চলছে পথচলা। খুঁজে নেওয়া হচ্ছে দিক নির্দেশনা। তিনি আছেন সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমানুষের চেতনায় প্রদীপ্ত আলোয়। গণমানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জাগরণের গান।

ছড়িয়ে আছে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন। দুঃখী মানুষের জীবন বদলানোর জন্য তাঁর অন্তহীন প্রেরণা আজকের বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য শোক কোনো শেষ কথা নয়। শোক যে শক্তির উৎস হয়, বাংলাদেশ তার প্রমাণ। এদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে বাকি রায়ও কার্যকর হবে। তাঁর মৃত্যুর পরে এদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে। তারা চেয়েছিল দেশটিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ঠেলে দিতে।

কিন্তু সেটা হয়নি। শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে দেশের মানুষ। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল হোক এটাই সবার প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার জয়গানে মুখরিত আজ শোকের মাস। তাঁর বক্তৃতার বাণী নিজেদের কণ্ঠে তুলে বলতে হবে, 'বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান– বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সকলেই এদেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সমঅধিকার ভোগ করবেন।'

বঙ্গবন্ধুর এই বাণী পৌঁছে যাক প্রত্যেকের চেতনায়। যেন কোনো ভুল আচরণ অদম্য শক্তির বাংলাদেশকে কলঙ্কিত না করে। মানুষের মর্যাদায় প্রদীপ্ত থাকুক তাঁর অবিনশ্বর চেতনা।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৯৬ সালে বিজয় দিবস উপলক্ষে সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। হোটেল শেরাটনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে জনাব শাহরিয়ার ইকবাল এবং আরো দু'একজন প্রযোজক উপস্থিত ছিলেন। জনাব শাহরিয়ার আমাকে আকস্মিকভাবে বললেন, যাঁকে সাক্ষাৎকারটি নিতে বলেছিলাম, তিনি নিতে পারছেন না। আপনি সাক্ষাৎকারটি নিন। আমি হতবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হলাম।

যা হোক শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎকারটি আমাকেই নিতে হলো। প্রসঙ্গ উঠল তাঁর বিখ্যাত এবং মুখে মুখে উচ্চারিত দুটি অমর পঙ্‌ক্তি নিয়ে–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন? তিনি বললেন, 'কবিতাটি আমি একাত্তর সালে লিখি। সে সময়ে একবার গুজবের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল যে পাকিস্তানের কারাগারে মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে। খবরটা শোনার পর আমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়াটি হয়। পরে তাঁর বেঁচে থাকার খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি'। তারপরে প্রায় একশ বছর বয়সের কাছাকাছি সেই মানুষটি সরল অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছিলেন, মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা? অন্নদাশঙ্কর রায় গভীর প্রত্যয় নিয়ে গাঢ় স্বরে এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। এত বছর পরও তাঁর কণ্ঠ আমার কানে বাজে। না, শুধু আগস্ট মাস এলেই নয়, তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাই যখন-তখন। ভাবি, ঠিকই বলেছিলেন তিনি। মুজিবের মৃত্যু সহজ কথা নয়। পুরো কবিতাটি এমন–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

২৩শে মার্চ ১৯৭১, বাড়ির বারান্দা থেকে জনতার অভিনন্দনের জবাবে হাত নাড়ছেন বঙ্গবন্ধু। পেছনে কন্যা শেখ হাসিনা

সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেমের একটি প্রবন্ধের নাম 'শেখের সমসাময়িক'। প্রবন্ধটি তাঁর *অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়: স্মৃতিপটে শেখ মুজিব ও অন্যান্য* গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'জীবদ্দশায় মুজিব বিশালদেহী কলোসাসের মতো আমাদের সংকীর্ণ পৃথিবীজুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। অপমৃত্যুর পর তাঁর অশান্ত আত্মা আমাদের মন ও মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিবেককে করছে বিচলিত। তাঁর পুণ্য রক্তের ঋণ, রক্ত দিয়েই শুধতে হবে, এর কোনো ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। আত্মসম্মান সম্পন্ন জাতির পক্ষে আর কোনো পথ খোলা নেই। কারণ, রফিক আজাদের ভাষায়, 'স্বদেশের মানচিত্রজুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর।' সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম এই প্রবন্ধটি শেষ করেছেন এমন একটি বাক্য দিয়ে– 'সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, শেখ মুজিবের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায়, সেই দরজা দিয়ে আমরা আমাদের নিয়তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি।'

যে মানুষের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায় সেই মৃত্যুহীন মানুষের সঙ্গেইতো আমরা ইতিহাসের দীর্ঘ সড়কে হেঁটে যাব। স্বদেশের মানচিত্রজুড়ে বিছিয়ে থাকা তাঁর বিশাল শরীর আমাদের জীবনে বটের ছায়া। এই ছায়া থেকে আমরা দূরে যেতে পারব না। শুধু আমরা চাই আমাদের পথের দুপাশে অবিস্মরণীয় আলো থাকুক, যে আলোয় ফুটে থাকবে পথ, পথের ধারের উজ্জ্বল বুনোফুল এবং আমাদের ইতিহাসের খুলে যাওয়া নতুন দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে নতুন আলো। আমরাও গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে বলব, 'মুজিবের মৃত্যু সহজ কথা নয়'।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ

একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার চরণ চারটি নিম্নরূপ:

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।

অন্নদাশঙ্কর রায় কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বরের 'কিছুদিন আগে কি পরে'। এ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় স্মৃতিচারণা করেছেন,

> তারিখটা ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারত দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি। আমরা ক'জন সাহিত্যিক যাচ্ছি সব স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান পুরুষদের অভিনন্দন জানাতে মুজিবনগরে।...
>
> 'শেখ মুজিবুর রহমান যদিও মুজিবনগর সরকারের শীর্ষে তবু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার মুজিবনগরে গিয়ে সম্ভব হতো না। সেদিন মুজিবনগর থেকে ফিরে আসি তাঁর জন্যে ভয় ভাবনা ও প্রার্থনা নিয়ে। যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, তার সবে আরম্ভ। যুদ্ধে হেরে গেলে পাকিস্তানিরা কি শেখ সাহেবকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেবে? প্রতিশোধ নেবে না? এর মাস চার-পাঁচ আগে থেকেই তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন বিশ্বময় ধ্বনিত হয়েছিল। তার জন্যে কলকাতার ময়দানে আমরা সাহিত্যিকরাও জমা হয়েছিলুম। তার কিছুদিন আগে কি পরে আমি রচনা করি "যতকাল রবে"...।'
>
> [অন্নদাশঙ্কর রায়: *কাঁদো প্রিয় দেশ*, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, অন্বেষা, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৮-৬০]।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর কবিতাটি অসাধারণ হয়ে ওঠে এবং এর তাৎপর্য নতুন করে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। বিশেষ করে, 'ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান' চরণটি অধিকতর বাঙ্ময় হয়ে আসে।

১৯৭৬ সালের একুশকে সামনে রেখেই প্রতিবাদী গল্প-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ১৯৭৮ সালের একুশের সংকলন *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সব মহলেই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতেই প্রথম প্রকাশিত হয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই চার লাইনের কবিতা আট লাইন হয়ে। শুধু তা-ই নয়, কবিতার শব্দও এতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এমনকি শব্দ আগপাছ হয়েও প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের এ সংকলনে প্রকাশিত কবিতাটি নিম্নরূপ:

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

[সূত্র: *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*, একুশের সংকলন, ঢাকা ১৯৭৮]

কবিতাটি এখানে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই মূলের অনুষঙ্গী হয়নি। **প্রথমত** চার চরণকে আট চরণ করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত** 'যতকাল' হয়েছে 'যতদিন' এবং 'ততকাল' 'ততদিন'-এ পরিণত হয়েছে। এছাড়া, মূল কবিতায় ছিল 'তবু নাই ভয় হবে হবে জয়' এটা পরিণত হয়েছে রবীন্দ্রচরণে 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়'।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার মূল পাঠ সেদিন বাংলাদেশে সুলভ ছিল না। কিন্তু *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনের পাঠ ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে যায়। দেশের দেয়ালে দেয়ালে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে যে প্রচুর দেয়াললিখন চলতে থাকে, তাতে কবিতাটির এই অশুদ্ধ পাঠই প্রাধান্য লাভ করে।

এমনকি ২০১০ সালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থ *কাঁদো প্রিয় দেশ* অন্বেষা প্রকাশনী নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাতে 'প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামে একটি ভূমিকা স্থান পেয়েছে। এতে লেখা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল ঘাতকের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার নিহত হওয়ার খবরে অন্নদাশঙ্কর রায় ভীষণভাবে মর্মাহত হন, নিন্দাও জানান। তারপরই তিনি সেই বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন–

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্ত গঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

এখানে অনেকগুলো ভুল তথ্য ও অশুদ্ধ পাঠ ঢুকে পড়েছে। প্রথমত অশুদ্ধ পাঠ সেই 'যতকাল-ততকাল'-এর জায়গায় 'যতদিন-ততদিন' এবং 'পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা'-এর স্থলে 'পদ্মা

সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়

মেঘনা গৌরী যমুনা' স্থান পেয়েছে। অথচ একই গ্রন্থের ভেতরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার মূল পাঠটি রয়েছে।

ভূমিকার সবচেয়ে বড়ো যে ভুল, তাহলো কবিতাটির রচনাকাল-সম্পর্কিত তথ্য। কবিতাটি লিখিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বরের আগে অথবা পরে।

বঙ্গবন্ধুর বহু স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি এখন স্মৃতি জাদুঘর। এই জাদুঘরের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর একটি সুদৃশ্য ম্যুরাল। এতে খোদিত রয়েছে এই বিখ্যাত কবিতাটিও, কিন্তু সেখানেও রয়েছে অশুদ্ধ পাঠ:

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

এখানে 'যতকাল' 'যতকাল'-ই আছে এবং 'ততকাল'ও 'ততকাল'-ই আছে। কিন্তু শব্দ আগপাছ হয়ে গেছে। যেমন: অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান

আর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে লেখা হয়েছে–

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান

এখানে পদ্মা'র পরে এসেছে মেঘনা'র নাম, কিন্তু মূল পাঠ অনুযায়ী পদ্মা'র পরে আসবে যমুনা'র নাম।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি অক্ষয় হয়ে থাকবে বাঙালির জীবনের ইতিহাসের পাতায়। দেয়ালে উৎকীর্ণ কবিতাটি পাঠ করবে বাঙালি সন্তানেরা।

তাই কবিতাটির শুদ্ধ পাঠ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতেও সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

বঙ্গবন্ধু: যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমাদের বাপদাদারা একবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। তখন উপমহাদেশ ভেঙে ভারত-পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। আমাদের পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব ও হিন্দু-মুসলিম বিরোধে বাংলা ভেঙে পাকিস্তানের সৃষ্টি। কিন্তু সেই সাতচল্লিশের স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শাসকদের জন্য। তারা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য গড়ে তোলে। অর্থনীতি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই জেকে বসে। পূর্ব বাংলার মানুষকে তারা শোষণ করে। দুবছর যেতে না যেতেই এই অবস্থা দেখে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল একটি অংশ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি দল গঠন করেন ১৯৪৯ সালে। দল গঠনের নেতৃত্ব দেন সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক প্রমুখ। আর দলটির নামকরণ হয় আওয়ামী (মুসলিম) লীগ। এভাবেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে সত্যনিষ্ঠ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি বাম গোষ্ঠীর আবির্ভাব।

পাকিস্তানের রাজনীতি তথা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে তখন গোলমেলে অবস্থা। নুরুল আমীন মুখ্যমন্ত্রী। মুসলিম লীগে দলীয় কলহ-বিভেদ এবং ক্ষমতার ভাগাভাগি। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ চুয়ান্নর ৮ই মার্চ পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠিত হয় হক-ভাসানীর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। যার নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ প্রগতিশীল নেতৃবর্গ। বেশ কটি দল এই ফ্রন্টে যোগ দেয়। ভাসানীর আওয়ামী লীগ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক দল, মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম, হাজী দানেশের গণতন্ত্র দল, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ও বামদের সমন্বয়ে গঠিত হলো ফ্রন্ট। আসন ভাগাভাগি হলো ফ্রন্টের। ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনে দাঁড়ালেন না। হক সাহেব ২টি আসনে দাঁড়ালেন। তরুণ মুজিব দাঁড়ালেন গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া আসনে। এই আসনে গোপালগঞ্জ থানার সকল ইউনিয়ন ও কোটালীপাড়ার সকল ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত হলো। টুঙ্গিপাড়া তখন পাটগাতী ইউনিয়নের একটি গ্রাম। শেখ মুজিব তাঁর নিজের আসনে নির্বাচনি প্রচারণায় না এসে ফ্রন্টের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ সফর করলেন। হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী বসে নেই। নৌকা প্রতীকে জোয়ার এল। পূর্ববঙ্গের মানুষেরা ফ্রন্টের ছায়াতলে দাঁড়ালো। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ তখন দিশেহারা। তাদের গুণ্ডা-পাণ্ডা ও পুলিশবাহিনী লেলিয়ে দিল ফ্রন্টের বিরুদ্ধে। হামলা, মামলা, গ্রেফতার চলল সমস্ত বঙ্গে। বিশেষ করে গোপালগঞ্জে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন হলো। ফ্রন্টের নির্বাচনি ২১ দফা তখন মানুষের মুখে মুখে। অবশেষে শেখ মুজিব ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে এলেন তাঁর নির্বাচনি এলাকায়। তাঁরা পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে প্রান্তিক এলাকায় জনসভা করলেন। এই আসনে মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গোপালগঞ্জের সীতারামপুর গ্রামের এবং মুসলিম লীগের কোটিপতি ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী ঠান্ডামিয়া। ঠান্ডামিয়া ক্ষমতার জোরে গোপালগঞ্জ শহরের আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবর্গকে হামলা, মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে নাস্তানাবুদ করলেন। প্রধান প্রধানদের জেলে পাঠালেন। অন্যদিকে সকল ইউনিয়নে রাতের অন্ধকারে টাকা বিতরণ করলেন। শেখ মুজিব অর্থহীন ক্যান্ডিডেট। নির্বাচনি খরচ জোগানোর টাকা-পয়সা নেই। তবুও তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন না। সাধারণ জনগণই তাঁর একমাত্র ভরসা।

শেখ মুজিবের বাড়ি কোটালীপাড়ার কাছাকাছি। এ এলাকার ভোটার সংখ্যা গোপালগঞ্জ থেকে কয়েক হাজার বেশি। শেখ মুজিব এলেন নেতাদের নিয়ে কোটালীপাড়ায়। কোটালীপাড়ার মানুষ আগে থেকেই শেখ পরিবারকে ভালোবাসতো। কোটালীপাড়ার বনেদি পরিবার কাজীরা ছিল শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। নির্বাচনে পুরো কাজী পরিবার, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মুজিব ভক্তদের মধ্যে আবদুল আজিজ, হাশেম মুনশী, মনসুর গাজী, গফুর পাইক, হাসেম রাঢ়ি, আহমদ আলী, আবুল হোসেন, মোশারফ হোসেন তালুকদার, জব্বার মিয়া, খালেক মিয়া, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, চান মিয়া, শেখ সেকেন্দার, ইসমাইল খন্দকার, আমির আলী প্রমুখ একজোটে নামলেন। আর মুজিবের অনুচর কবি শেখ রোকনউদ্দীন গঠন করলেন 'নির্বাচনি সংগীত দল'। তার লেখা গান সকল নির্বাচনি জনসভায় পরিবেশন করত কিশোর গায়ক চান মিয়া প্রমুখ। গান শুনে জনগণ মাতোয়ারা। মুজিব যেখানে, রোকনের দলও সেখানে। মোট আটাশটি ইউনিয়নে মুজিব তাঁর দলবল নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

সেকালে এত মিডিয়া ছিল না। বেতার ও পত্রিকাই সবেধন নীলমণি। বেতারে নির্বাচনি প্রচারণা হতো না। পত্রিকা ঢাকা থেকে মফস্বলে পৌঁছাতে সময় লাগত ৪/৫ দিন। আর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতো অনেকদিন পরে। যেমন যুক্তফ্রন্টের ৮ই মার্চের নির্বাচনি ফল বের হলো ১০ দিন পর ১৮ই মার্চ। সাধারণ ভোটার

অবশ্য বেতার পত্রপত্রিকার ধার ধারত না। লোকমুখেই প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ত এলাকা থেকে এলাকায়।

গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া নির্বাচনি এলাকার ভোট গণনা গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া দু জায়গাতেই করা হয়। গোপালগঞ্জের সকল ইউনিয়নের ভোট গোপালগঞ্জ শহরে এবং কোটালীপাড়ার সকল ইউনিয়নের ভোট কোটালীপাড়া সদরে। এদিকে মুজিব ভক্তরা বুঝতে পেরেছিল– তাদের মুজিব ভাই জিতবেনই, তাই তারা মুজিব ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বাড়িতে শামিয়ানা টাঙিয়ে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল। গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠানটি করা হয়নি অন্য কারণে। ক্ষমতাসীন ঠান্ডামিয়ার লোকজনদের শহরে ছিল অনেক দাপট।

মহকুমা শহর বলেই গোপালগঞ্জের সকল ইউনিয়নের ভোট গণনা আগে হয়েছিল। গণনায় দেখা গেল মুজিবের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ঠান্ডামিয়া তিন হাজার ভোট বেশি পেয়েছে। মুজিবের সমর্থকরা চোখে অন্ধকার দেখলেন। গণনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখনো কিন্তু কোটালীপাড়ার ভোট গণনার ফল বের হয়নি। অন্ধকার চোখে মুজিব ভক্তরা কেউ গেলেন টুঙ্গিপাড়া, কেউ ১৫/১৬ মাইল পায়ে হেঁটে কোটালীপাড়া। এদিকে এ খবর কোটালীপাড়া পৌঁছলে অনেকে মূর্ছা গেলেন। হতাশ বদনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন টুকু কাজী, আজিজ, রোকন, গফুর, হাশেম মুনশী, মনসুর গাজী, সেকেন্দার প্রমুখ। তাদের স্বপ্ন বুঝি বিফলে যায়। যারা শেখ বাড়ির উঠোনে বাদাম (নৌকার পাল) টানিয়ে এবং হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ফলের, তখন তারা বোধশক্তিহীন। অনেক দুঃখ-বেদনা নিয়ে কোটালীপাড়ার সমর্থকরা ঠিক করলেন– সিও স্যারের ভোট গণনা হলেই টুঙ্গিপাড়া যাবেন। হঠাৎ শেখ সেকেন্দার পাগলের মতন দৌড়ে এসে বললেন, মুজিব ভাই জিতেছেন, মুজিব জিতেছেন। কোটালীপাড়ায় ঠান্ডামিয়ার চেয়ে তেরো হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন। গোপালগঞ্জে তিন হাজার ভোট কম পেলেও এখন মুজিব ভাই দশ হাজার ভোটে এগিয়ে।

চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। পূর্বপাড়ার চাঁদমিয়া এ খবর নিয়ে দৌড়ালেন গোপালগঞ্জের পথে। চারদিকে হইহুল্লোর। সেকেন্দারের ভাঙা চোঙায় শেখ মুজিবের বিজয়ের ঘোষণা ঘাঘোরহাট, পশ্চিমপাড় ও সিকির বাজার প্রকম্পিত করে তুলল। আনন্দ খুশিতে ভাসল কোটালীপাড়ার জনগণ। মুজিব ভক্তরা দেরি না করেই নৌকোয় রওয়ানা দিল ঘাঘোর নদীর পথে টুঙ্গিপাড়ায়।

টুঙ্গিপাড়ায় তারা যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে নামছে। ঘরে তেলে-কুপি জ্বালিয়েছে গৃহবধূরা। কিন্তু শেখ বাড়ির হ্যাজাক লাইট জ্বলেনি। মুজিব মনমরা হয়ে বসে আছেন বারান্দায়। কোটালীপাড়ার ভোটের খবর তখনো পৌঁছায়নি টুঙ্গিপাড়ায়। মুজিবের বিশ্বাস ছিল ঠান্ডামিয়া টাকা দিয়ে কোটালীপাড়ার ভোটারদের কিনতে পারবে না। তাঁর সেই বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হয়নি। কোটালীপাড়ার মুজিবের ভক্তরা পাটগাতীতে নৌকো থেকে নেমে সোজা টুঙ্গিপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরল। তার সামনে সেকেন্দারের টিনের চোঙা। চোঙায় সেই বিজয়ী শব্দ: মুজিব ভাই জিতেছে। ঠান্ডামিয়া ঝান্ডা নিয়া পালাইছে। চতুর্দিকে শোরগোল। চোঙা শুনেই ঘরবাড়ির লোকজন ছুটে এসেছে। শেখ বাড়িতে আবার হ্যাজাক লাইট জ্বলে উঠেছে। বাদামের নিচে শত শত মানুষ। গোপালগঞ্জ থেকেও খবর এসেছে– শেখ মুজিব দশ হাজার ভোট বেশি পেয়ে জিতেছেন।

বাদামের খুঁটির সাথে বাঁধা হ্যাজাক লাইট। নিচে মাদুর ও হোগলাপাতার বিছানা। অদূরে পানসুপারির বাটা ও হুক্কা তামাক। বাদামের উত্তরপাশেই ঘর। ঘরের সামনে দুটি কাঠের চেয়ার। সাদা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি গায়েই শেখ মুজিব বাইরে এলেন। অনেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মুজিবকে। সেকেন্দার তো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

মুজিব চেয়ারে বসলেন। অন্য চেয়ারে বসলেন তাঁর চাচা শেখ মোশারফ হোসেন খান সাহেব। কোটালীপাড়ার লোকেরাই মুজিবকে মালা পরিয়ে দিলেন। মুজিব গলা থেকে মালা হাতে নিয়ে বললেন, আমার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়নি। এ বিজয় কোটালীপাড়াবাসীর, তারাই আমাকে জিতিয়েছে। আমি কোটালীপাড়ার মানুষ। আমি চিরকৃতজ্ঞ। রোকনউদ্দীনকে ডেকে বললেন, জালিম মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে গান বাঁধ।

চুয়ান্নর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। ফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে পায় ২২৩টি আসন। আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে ১৩৪টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন হেরে যান। ফ্রন্ট ভোটে জিতে হক সাহেবের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এই সরকারে প্রথম বারে আওয়ামী লীগের স্থান হয়নি। সেখানেও ষড়যন্ত্র। পরে অবশ্য মন্ত্রিপরিষদে শেখ মুজিবের স্থান হয়। কিন্তু চুয়ান্নর সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। পাকিস্তানিরা এ সরকারকে অচিরেই বরখাস্ত করে ভুয়া কারণ দেখিয়ে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারা

ড. আব্দুস সামাদ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি, বাঙালি জাতির ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীতে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও খুব অল্পসংখ্যক নেতা ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই একজন অনন্য আর কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল– শোষিত মানুষের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৪

প্রতিষ্ঠা। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের মূল্যবান অনেক সময় কারাবন্দি হিসেবে কাটাতে হয়েছে। বাংলার আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বিক্ষোভ সর্বোপরি আবহমান বাংলার সকল বৈশিষ্ট্যকে তিনি নিজের জীবনে আত্মস্থ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কোনো অন্যায়ের সাথে তিনি কখনো আপোশ করেননি। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো আর সোনার বাংলা গড়া তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হলেও তিনি একইসঙ্গে বিশ্বের যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম চলেছে, সেখানেই ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। বঙ্গবন্ধু ৩০শে অক্টোবর ১৯৭০-এ নির্বাচনি জনসভায় বলেন, 'নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহল আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্যে আমি গণ-আন্দোলনের ডাক দেবো। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য এটা আমার শেষ সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু আরো বলতেন, 'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি'।

একজন আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সার্থক মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একজন মহান সেনানী ও অগ্রনায়ক এবং সমকালীন বিশ্বে মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সন্তানদের একজন। বাংলার জনগণ কীভাবে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবে, এগুলো ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিয়ত চিন্তাধারা। আর একারণেই তিনি তাঁর নিজের জীবনের সকল সুখ-শান্তি ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু ৩রা জানুয়ারি ১৯৭১, ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে, এম.এন.এ ও এম.পি.এ-দের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন–

> প্রধানমন্ত্রী হবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের সংগ্রামের ফসল হিসেবেই বাঙালি জাতি পেয়েছে তাদের স্বাধীনতা আর বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে অনন্য মর্যাদা। বাঙালি জাতির ইতিহাস-চেতনা ও জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বিকাশের অগ্রগতির ধারায় তাদের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম সার্থক হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন সফল করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝতে হলে একটি বিষয় ভালোভাবে মনে রাখার আছে। সেটি হলো তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থেকে ঔপনিবেশিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য তিনি প্রথমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং তারপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বহুদিন সংগ্রাম করেছেন। দেশ স্বাধীনের পর মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু হলেও বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অতুলনীয় বাগ্মিতা দিয়ে কোটি কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু তাত্ত্বিক ছিলেন না কিন্তু তাঁর ছিল সুনির্দিষ্ট আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বাঙালি মুক্তির লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে

পৌঁছানোর জন্য একনিষ্ঠ এবং নিরলস কাজ করে যাওয়ার ক্ষমতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

> একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। নিরন্তর সম্প্রীতির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাঙালি জাতির ললাটে স্বপ্নের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সকল অর্থেই বাঙালি জাতির স্বদেশের প্রতিচ্ছবি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত আমাদের চেতনাকে মুক্ত করেছিলেন আবহমান বাংলার বৈশিষ্ট্য, জাতীয় চরিত্র, গণ-আন্দোলনের মহান গুণাবলি এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে ভালোবাসায় ও সহমর্মিতায় তাঁর নিজের মধ্যে আত্মীকরণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন–

> স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হবেন। তাঁকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করব, সেবা করব। তাঁর সঙ্গে যোগ রেখেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে মানুষটিকে খুঁজেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার সন্ধান পেতে আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

অসহায়-বঞ্চিত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বঙ্গবন্ধুর কোমলমতি মন সবসময় কেঁদে উঠত। অল্প বয়স থেকেই দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও তাঁদের হিত সাধনে কিছু করার জন্যে সারাক্ষণ তিনি ব্যাকুল থেকেছেন। গ্রীষ্ম-বর্ষায় দীনহীনদের মাথায় ছাতা তুলে ধরা, অভুক্ত সহপাঠীদের নিজের হেঁশেল ঘরে দুধ-ভাত খাওয়ানো, গরিব ছাত্রদের জন্য মুষ্টিভিক্ষা করা, মন্বন্তরে বাবার গোলার ধান বিলিয়ে দেওয়া মানুষের জন্যে এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের সাধনা। কৈশোর থেকেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন লোকসাধারণের হিতসাধনে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে অর্জন করেছেন নেতৃত্বের গুণাবলি, অজেয়কে জয় করার মানসিক দৃঢ়তা। বিশ্বে গণতন্ত্রকামী স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর মতো এমন নেতৃত্ব বিরল। বাংলাদেশের মানুষের গভীর মমতা ও ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি নিজে সারাজীবন দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন। দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটোছুটি করেছেন। দেশের প্রতিটি বালিকণার সাথে তাঁর রয়েছে নাড়ির সংযোগ। প্রকৃত অর্থেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম। তিনিই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়,

> বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না... আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল বাঙালি এবং মানব সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর ভালোবাসা। বাঙালি জাতিসত্তা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্তি, জনসম্প্রীতি ও জনগণের রাজনীতি, অসাম্প্রদায়িকতা তথা সকল নাগরিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ এবং চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে। উপর্যুক্ত আদর্শসমূহকে ধারণ করে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব– এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায় জাতির পিতাকে বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও অবিচল থেকেছেন তিনি। সংগ্রামী এই জীবন শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতার মর্যাদায় আসীন করেছে। এই সময় তিনি নিজে যেমন সংগ্রামী চেতনায় বেড়ে উঠেছেন, পুরো জাতিকেও অনুরূপ বেড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১– এই ২৪ বছরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান ও সফল হয়েছে, কিন্তু তিনি সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিলেন।

বাঙালির জাতিসত্তার স্বীকৃতির আন্দোলনকে তিনি সবসময় দেখেছেন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন হিসেবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে বার বার জেলে যাবার মতো দেশপ্রেমের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা আন্দোলনের পর থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকে একমাত্র দাবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। সত্তরের নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান দুটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এ সময় তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষে ঐকমত্যে নিয়ে আসেন। যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের হ্যামিলনের বংশীবাদকের জন্ম না হতো এদেশে, যদি তিনি এমন করে স্বদেশের স্বাধীনতার

বঙ্গবন্ধুর কোলে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম লালু

জন্যে বার বার প্রকৃত বীরের মতো মৃত্যুর মুখোমুখী হবার সাহস না দেখাতেন, তাহলে আমরা এত দ্রুত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম না।

বঙ্গবন্ধু নিজেকে সব সময় জনগণের সঙ্গে এক করে দেখতেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের মতো অনেক আদর্শের কথা বললেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানো ও জনগণের ইস্যুকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল তাঁর মূল রাজনৈতিক আদর্শ। তিনি ছিলেন জনতার নেতা। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি সামনের দিকে, প্রগতির দিকে নিতে চেয়েছেন। তাঁর সব বিষয়ে শেষ ভরসা ছিল মানুষের ওপর। তিনি নিজেকে একাধারে বাঙালি এবং মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেন আর সব সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন। বঙ্গবন্ধু নিয়মিত নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন, এমনকি নিয়মিত কোরান শরিফ পড়তেন। একই সাথে তিনি সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন আর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র বলতে শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতেন। স্বাধীনতার পর তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি কোনো বৈষম্য দেখতে চাননি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমূহ পর্যালোচনা করলে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রিক স্বপ্নসমূহ প্রকাশ পায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন ভাষণে বলেছেন–

> 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব' ... 'ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক, এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে'।... 'আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার'।... 'করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করছি।'

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আছেন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের অকৃত্রিম ভালোবাসায়। কালের চিরন্তন বেলায় তাঁর আদর্শ ও নীতি তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া হঠাৎ করে হয়নি। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আর সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রতিহত করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, তা যে কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করতে হবে– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বঙ্গবন্ধুকে আজ আমরা পেয়েছি এই ইতিহাসের পাদপীঠে যেখানে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষায়-বেদনায়-ভালোবাসায় আর কর্মের প্রবাহে তিনি আবহমান বাংলা ও বাঙালিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন। সেখানে আমরা তাঁকে হারিয়েছি, এই মর্মান্তিক কথাটা কখনো আমাদের অন্তরের সত্য হতে পারে না। মহাকবি শেলীর ভাষায়–

> সে বেঁচে আছে, সে জেগে আছে–
> মৃত্যুই গতায়ু আজ, সে নয় কখনোই।

তথ্যসূত্র

১) শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।

২) শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৭।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ,' *রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলি*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩।

৪) আতিউর রহমান, *বঙ্গবন্ধু: সহজপাঠ*, ঢাকা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০১২।

৫) আতিউর রহমান, *বাংলাদেশের আরেক নাম শেখ মুজিব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০।

৬) আ. হাই ভূঁইয়া, *মুজিব মানেই বাংলাদেশ*, ঢাকা, রাজিব এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০১০।

৭) হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*: ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২।

৮) *বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশনা*, বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, আগস্ট, ২০১১।

৯) শেখ হাসিনা, 'শেখ মুজিব আমার পিতা', *বিচিত্রা* ১৬ই আগস্ট, ১৯৯৬।

১০) মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০০।

১১) রওনক জাহান, 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা', *প্রথম আলো*, ১৫ জুলাই ২০১৯।

১২) *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০১।

১৩) এম আনিসুজ্জামান, *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১।

১৪) *জয়তু বঙ্গবন্ধু*, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নীলদল, ঢাকা, ২০১৬।

১৫) www.google.com, *BBC online Survey: Bangabandhu Sheikh Mujib* `The Greatest Bangalee of all Times'.

লেখক: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির মণিকোঠায়

ড. মোহাম্মদ হাসান খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি এদেশের মানুষকে তাঁর পরিবার মনে করতেন। সে কারণেই হাজার হাজার নেতা-কর্মী, সাধারণ মানুষের নাম ও চেহারা মনে রাখতে পারতেন তিনি। কোনো মানুষের সঙ্গে একবার দেখা হলে বিশ-তিরিশ বছর পরেও তাকে দেখলে চিনতে পারতেন। আর পারবেন নাই বা কেন? তিনি যে বঙ্গবন্ধু। এদেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা। মানুষকে আপন করে নেওয়ার এমন ক্ষমতা বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কার আছে? কে পেরেছেন বটবৃক্ষের মতো সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে ধরতে! আর তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমাদের একটিই দেশ, একটি পতাকা, একজন জাতির পিতা। এই মানুষটি আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে আছেন। এ লেখায় সাধারণ মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হলো।

ঘটনাকাল ১৯৬৯-এর জুন মাস। বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর শহরের অম্বিকা ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় বক্তব্য দিয়ে ফিরছিলেন। ফেরার পথে জনৈক জেলারের বাসার সামনে দায়িত্বরত এক পুলিশকে দেখে তিনি গাড়ি থামালেন। তারপর বঙ্গবন্ধু ঐ পুলিশ সদস্যকে উচ্চৈঃস্বরে 'আলমগীর' বলে কাছে ডাকলেন। তার খোঁজখবর নিলেন। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অর্থনীতিবিদ মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব। তিনি ভেবেছিলেন– পুলিশ সদস্য আলমগীর হয়ত বঙ্গবন্ধুর কোনো আত্মীয় হবেন। কিন্তু পরদিন আলমগীর জানালো, বঙ্গবন্ধু তার আত্মীয় নন। তিনি ১৫ বছর আগে ডিউটি করতেন সেন্ট্রাল জেলে। তখন বঙ্গবন্ধু ঐ জেলে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সঙ্গে দু-তিনবার দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ তিনবার দেখা হওয়া সাধারণ এক পুলিশ সদস্যের নাম ও চেহারা বঙ্গবন্ধু ১৫ বছর পরেও মনে রেখেছিলেন। এমনি স্মৃতিশক্তি বঙ্গবন্ধুর!

১৯৬৪ সালের আর এক ঘটনা। ছাত্রনেতা আবু আহমেদ কুমিল্লার গুণবতী হাই স্কুলের ছাত্র। নির্বাচনি প্রচার করতে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কুমিল্লার গুণবতী স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শোনার জন্য শত শত লোক উপস্থিত হন। স্টেশনে ট্রেন থামলে আবু আহমেদ বিশেষভাবে সাধারণ মানুষের মনের আকুতির কথা বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরেন। তার কথা শুনে বঙ্গবন্ধু সেদিন জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। যাওয়ার সময় আবু আহমেদকে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ঢাকা আসিস এবং দেখা করিস'। এর ৯ বছর পর আবু আহমেদ ১৯৭৪ সালে পেশাগত সমস্যার কারণে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এই ৯ বছরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার দেখা বা কথা হয়নি। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আবু আহমেদ কিছু বলার আগেই বঙ্গবন্ধু বললেন, 'মি. গুণবতী, কী চাস'? এ থেকে বুঝা যায়, ১৯৬৪ সালে স্টেশনে মাত্র একদিনের দেখায় গুণবতী হাই স্কুলের আবু আহমেদকে ১৯৭৪ সালেও চিনতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্মবার্ষিকীর একক বক্তৃতায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, একটা যুবক এল তার একটা চাকরি দরকার। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, তোর বাড়ি কোথায়? ও খুলনার একটা এলাকার নাম বলল। তখন তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, তোর মায়ের নাম এটা? তোর মা কি আগের মতো এখনো পিঠা তৈরি করে? এটা শুনে ওই ছেলে আবেদন-আরজি করবে কী, সে কেঁদে ফেলেছে। একটা বড়ো মাপের মানুষ, একটা ছেলেকে এই প্রশ্ন করছেন! বঙ্গবন্ধু মনে রেখেছিলেন গ্রামের এক মায়ের পিঠা বানানোর কথা।

১৯৪৬ সালে ভারতের সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় ছিল। ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে। নিখিল চক্রবর্তী ভেবেছেন, এত বছর পর বঙ্গবন্ধু চিনবেন না তাঁকে। বঙ্গভবনের দরবার হলে একবারে পেছনের সারিতে তিনি (নিখিল চক্রবর্তী) বসলেন। তার মনে একটি কথা– আমার এই পুরোনো বন্ধু আমাকে চিনবে না, চিনবার কারণও নেই। বঙ্গবন্ধু দরবার হলে প্রবেশ করলেন, চারদিকে তাকালেন। একসময় তাঁর দৃষ্টি সেই ভারতীয় সাংবাদিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন। 'তুই নিখিল না'? নিখিল চক্রবর্তী অভিভূত। এত বছর পর আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তার প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুর কাছে। 'আপনি কী? তুই গেল কোথায়'? বঙ্গবন্ধুর উত্তর। বঙ্গবন্ধু নিখিল চক্রবর্তীকে জড়িয়ে ধরলেন। এই ছিলেন ব্যক্তি মুজিব। কোনো অহংকার নেই, মানুষের থেকে কোনো দূরত্ব নেই। (সূত্র: সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসানের বক্তৃতা)।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক

অধ্যাপক ড. আবদুল খালেকের একটি কলাম *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় পড়েছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তির একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি লিখেছেন, জয়নাল আবেদীন নামক আওয়ামী লীগের একজন সাধারণ কর্মীর এক আত্মীয়কে (শ্যালক) অনেক দিন পর দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই জয়নালের শালা না'? মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক জাদুকরী ক্ষমতা হচ্ছে তার নাম মনে রাখা। যেসব কারণে একজন মানুষ হাজার হাজার মানুষের নাম মনে রাখতে পারে তা হচ্ছে প্রখর স্মৃতিশক্তি, মানুষের প্রতি আগ্রহ এবং অকৃত্রিম ভালোবাসা। কিন্তু পৃথিবীর খুব কম লোকেরই এই অসাধারণ গুণটি থাকে।

আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন আলী মেহদী খান। তার কাছে বঙ্গবন্ধুর স্মরণশক্তির গল্প শুনেছেন তার ছেলে মহিবুল ইজদানী খান ডাবলু। তিনি লিখেছেন, একদিন গণভবনে নেতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসেন। তার পড়নে ছিল লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। গেটে পাহারারত পুলিশ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কিছুতেই গণভবনের ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এমন সময় বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাবা গণভবনের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছিলেন। বাবা তখন গাড়ির সামনের আসনে বসা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে গেটের একপাশে অসহায়ের মতো দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে বঙ্গবন্ধু গাড়ি থামাতে বললেন। পরে তিনি নিজে গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোককে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের পাশে বসিয়ে গণভবনের ভেতরে নিয়ে আসেন। গণভবনে রুমের ভেতরে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর তারা দুজন একসাথে বাইরে এলে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত সকলকে বললেন, 'আপনারা যারা এই ভদ্রলোককে গণভবনের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন, আপনারা তার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনাদের জানার কথাও নয়। পাকিস্তানি পুলিশ যখন আমাকে গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে আমাকে তার বাসায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমি তার কাছে অনেক ঋণী। তার এই ভালোবাসার কথা, তার এই উপকারের কথা– আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না।' সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐ ভদ্রলোক কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে কিছু চাইতে আসেননি, এসেছেন নেতার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য। এই হলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু।

১৯৫৫ সাল। ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টু বরিশাল মঠবাড়িয়া স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়েন। রাজনৈতিক কাজে শেখ মুজিবুর রহমান একবার বরিশালের মঠবাড়িয়াতে যান। 'ফুটবল খেলা' পিন্টুর দারুণ নেশা ছিল। ঐ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সৌজন্যে মঠবাড়িয়া হাই স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। জাকারিয়া পিন্টু জানান, তিনি স্কুলের পক্ষে অংশ নিয়ে দু-দুটি গোল করে অফিসার্স ক্লাবের পরাজয় ত্বরান্বিত করেন। খেলা শেষে বঙ্গবন্ধু তাকে কাছে ডেকে খেলার প্রশংসা করে মাথায় হাত বুলাতে থাকেন এবং তার বাবা ক্যাপটেন নাজিমউদ্দিনকে ডেকে বলেন, ছেলেকে যেন সে ফুটবল খেলতে আরো উৎসাহিত করে। জাকারিয়া পিন্টু স্মৃতিচারণে বলেছেন, '৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল দেশের বাইরে প্রথম মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত মারদেকা কাপ ফুটবলে অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে পুরো ফুটবল দল গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান। এসময় এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। জাকারিয়া পিন্টু বঙ্গবন্ধুকে দেখে সালাম দিতেই বঙ্গবন্ধু চিনতে পারেন এবং বলেন, 'তোকে বলেছিলাম না– তুই বড়ো ফুটবলার হবি'। এই হলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। যাকে একবার দেখেছেন, তাকে মনে রেখেছেন আজীবন।

বর্ণিত সবগুলো ঘটনাই বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তির। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেও বাংলাদেশের মানুষই তাঁর পরিবার। মানুষের জন্য কাঁদতে পারেন, মাথায় স্নেহের স্পর্শ করতে পারেন। মানুষের খুব কাছে যেতে পারেন। যাঁকে দেখলেই মনে হয় আমাদের একজন হাসু বুবু আছেন। আমাদের কোনো ভয় নাই। আমাদের সকল ভাবনা তিনি একাই বহন করবেন। এক বহ্নিশিখা। সকল অপশক্তি, পেশিশক্তি যাঁর কাছে মাথা নত করে। আজীবন তাঁর মঙ্গলময় স্পর্শ আমাদের ওপর থাকুক– এই প্রার্থনা।

জয়বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক: সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, চাঁদপুর জেলা শাখা

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং শোক দিবস

বিনয় দত্ত

তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

নির্মলেন্দু গুণের 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনী' কবিতায় কবি একজন মহাপুরুষের বিদায়ের ক্ষণকে অঙ্কিত করেছেন পদ্যের ছন্দে যাতনার মধ্য দিয়ে। এই যাতনা একজন গগনবিদারী কণ্ঠস্বরের থেমে যাওয়ার, একজন গিরি-পর্বত সমান মানুষের বিদায়ের, একটি জাতির মহান নায়কের চিরবিদায়ের। কবি আক্ষেপ করে কবিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙালির বিদায়কে মুহুর্মুহু করে তুলেছেন তাঁর লেখনীতে।

সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বাংলাদেশকে চিনে, জানে। বাংলাদেশের আচার-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে জানে। আর জানে বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জন্য কত বড়ো সম্পদ ছিলেন তা আমরা আজ তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিটি ক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মের জন্য বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মহানায়কের দরকার। যা আমাদের ছিল। তাই আমরা আজ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি, নিজের মাতৃভাষায় আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক নাম, যাঁর গোটা জীবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে। টুঙ্গিপাড়ায় এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান স্কুল জীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কৈশোরে তাঁর রাজনীতির দীক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন শেখ মুজিব। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়াকালীন তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। ঐ সময় থেকেই নিজেকে ছাত্র-যুবনেতা হিসেবে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন– যা পরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আওয়ামী লীগ নাম নেয়।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণদাবি আদায়ের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব।

১৯৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, যার ফলে ১৯৬৮ সালে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হতে হয়। ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে মুক্ত করে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের ম্যান্ডেট লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি

শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এ নির্বাচনি বিজয়কে মেনে নেয়নি। ১৯৭১-এর মার্চে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে রচিত হয় অমর কবিতা। এই অমর কবিতায় উচ্চারিত হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

সাতই মার্চের ১৭ মিনিট ২ সেকেন্ডের সেই অমর কবিতার প্রতিটি শব্দ এত গভীর, এত দৃপ্ত, এত বেশি পরিমাণে সকলকে চিন্তার খোরাক দেয় যে, তা বার বার শ্রবণের আগ্রহ তৈরি করে। এই তীব্র আগ্রহ নিবারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন রেসকোর্স ময়দানে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ পায়ে হেঁটে, বাস-লঞ্চে কিংবা ট্রেনে চেপে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল বিশাল ময়দান। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়েছিলেন উত্থিত বাঁশের লাঠি হাতে সমবেত লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ মানুষ। বাতাসে উড়ছিল বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সূর্যের অসংখ্য পতাকা।

বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছেন বাঙালির দুঃখের কথা, নিজের আকুলতার কথা, বাঙালির অধিকারের কথা। অমর কবিতার মহান কবি নিজেকে উদারভাবে তুলে ধরেছেন কোটি কোটি মানুষের সামনে। এই কবিতায় একদিকে যেমন দুঃখের কথা উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিলে বাঙালি কীভাবে তা হরণ করে নিবে তার কথাও।

প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

সেই অমর কবিতায় শত্রুপক্ষকে এত নিখুঁতভাবে সুকৌশলে কবি নিয়ন্ত্রণ করেছেন যা ইতিহাস স্মরণে রেখেছে। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর আচরণ বঙ্গবন্ধুর একদমই পছন্দ না কিন্তু তিনি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঠিকই তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে। শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকে তিনি অধিকারের স্বরে বলেছেন–

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো,
কেউ কিছু বলবে না।
গুলি চালালে আর ভাল হবে না।
সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়া রাখতে পারবা না।
বাঙালি মরতে শিখেছে,
তাদের কেউ দাবাতে পারবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র অলিখিত ভাষণ– যা বঙ্গবন্ধু নিজের বোধ থেকে বলেছেন এবং কোটি কোটি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দাবিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একাত্তরের রেসকোর্স ময়দানের সেই ভাষণটি আসলে ছিল মহাকাব্য। নির্মলেন্দু গুণের সাথে আমি বলতে চাই–

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর–কবিতা খানি
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধু এক বাক্যে বাঙালির ভবিষ্যৎ রচনা করে বলেছিলেন, বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আজকের পদ্মা সেতু। আমরা এখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। এখন বিশ্বের দুয়ারে 'বাংলাদেশ' শুধু একটি নামই নয়। বাংলাদেশ এখন ঘুরে দাঁড়ানোর অনন্য উদাহরণের একটি দেশ। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থান বিশ্ব দরবারে প্রশংসনীয়।

যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রূপকার সেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর কাছের মানুষ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু একটিবারের জন্যও খন্দকার মোশতাককে সন্দেহ করেননি বরং যখন যে যেভাবে খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে তাঁকে বলতে এসেছেন তিনি সেসব কথা কানে তোলেননি। কতটা উদার হলে বঙ্গবন্ধু মোশতাককে নিজের কাছে রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই, আছে শুধু স্মৃতি। সেই স্মৃতি, সেই শোক, সেই সাহস, সেই ভাষণ, সেই দাম্ভিকতা আজকের বাংলাদেশের পাথেয়। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আজকের বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের মহাস্রোতে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

গণ-মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু

মিনা মাশরাফী

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে শিল্পীরা চিত্রকর্মের পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন ভাস্কর্য। ভাস্কর্যের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে উদ্ভাসিত করার এ তৎপরতা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, বাঙালির দ্রোহ ও সংগ্রামের অপরাজেয় ইতিহাস এখানে মূর্ত হয়ে আছে।

তেজগাঁওয়ে শ্রমিক-জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু

এই মহানায়ক ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ব্রিটিশ শাসিত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (গোপালগঞ্জ বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। তাঁর জন্মকালীন সময়টাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদায়ের দাবি আন্দোলন, সংগ্রাম প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। তখনকার স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রামী পরিবেশের প্রভাব এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে শৈশব-কৈশোর থেকেই তিনি এদেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন সব মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার। সহপাঠীদের জন্যও তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। এজন্য তাঁকে বছরে অনেকবার ছাতা কিনে দিতে হতো কারণ সহপাঠীদের যেন বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরতে না হয়। তিনি তাঁর ছাতাটি দিয়ে দিতেন বন্ধুকে, প্রায়ই তিনি এধরনের ঘটনা ঘটাতেন। একদিন বন্ধুদের সাথে স্কুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ দেখে রাস্তার মোড়ে গলির ধারে এক বৃদ্ধ ফকির শীতে কাঁপছে আর কাঁদতে কাঁদতে ভিক্ষা চাইছে। লোকজন দাঁড়িয়ে দেখে এবং কেউ কেউ দু' পয়সা দিয়ে চলে যায়। খোকা (বঙ্গবন্ধুর শৈশবের ডাক নাম) বন্ধুদের নিয়ে থমকে দাঁড়ায় তারপর গায়ের চাদরটা মুহূর্তে খুলে দ্রুত বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধ হতবাক হয়ে ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট উচ্চারণে দোয়া করে বলে 'বড়ো হও বাবা, আল্লাহ তোমারে বাঁচায়ে রাখুক, তুমি অনেক বড়ো হও, রাজা হও'। তাঁর গায়ের নীল শার্টটিও একদিন খুলে দিয়ে এসেছিলেন নৌকা বাওয়া গরিব ছেলেটিকে। (বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও লেখক বেবী মওদুদের শেখ মুজিবের ছেলে বেলা নিয়ে প্রকাশিত লেখা থেকে এসব জানা যায়)।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি খুব সাহসী ও প্রতিবাদী ছিলেন। শেখ মুজিব যখন স্কুল ছাত্র, সে সময় একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জের ধরে কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির রোষানলের শিকার হয়ে কারাবরণ করতে হয়েছে তাঁকে। সেই থেকে তাঁর কারাবরণ শুরু। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ১৪ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পর ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ইন্টার মিডিয়েটে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায়। সে সময় কলকাতায় দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে শেখ মুজিবের অগ্রণী ভূমিকা অনেক প্রশংসনীয় ছিল।

রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্যকে আদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। কোনো প্রতিকূলতায় পিছিয়ে পড়েননি, শত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছেন। এগিয়ে গেছেন সমস্ত বাঁধাকে অতিক্রম করে।

১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব কারাগারে বন্দি ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে মুজিব কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় বিরতিহীনভাবে তেরো দিন অনশন পালন করেন। অনেক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন কারাগারের ভেতর থেকে নির্দেশনা দিয়ে। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি মন্ত্রী থাকেননি। আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সারা দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুসহ আরো অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে হাইকোর্টে রিট আবেদনের মাধ্যমে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধু সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারের লক্ষ্যে গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে বঙ্গবন্ধুকে আবারো গ্রেফতার করা হয়। ১৮ই জুন বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। সে বছরই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র-নেতাদের সমন্বয়ে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

এভাবেই তিনি সবধরনের আন্দোলনে অনড় থেকে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে দৃঢ় ও সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। সেসময় থেকেই বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণ

মানুষের অন্তরের আশা ভরসার নেতা হয়ে ওঠেন। বার বার মৃত্যু ঝুঁকি মাথায় নিয়ে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শুধু বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়াসহ সারাবিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের নেতা। ইতিহাসে নানা প্রতিবন্ধকতার মহাসড়কে বঙ্গবন্ধু নিজস্ব পথ তৈরি করে এগিয়ে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল মুসলিম লীগের রাজনীতি দিয়ে। পরবর্তীতে নানারকম অবস্থায় মতভেদের মুখোমুখী হয়ে সমন্বয় হীনতার প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক ও বাহক। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ও শ্রেণি চরিত্র প্রত্যক্ষ করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তান বাঙালির স্বপ্নপূরণ করতে পারবে না বা পাকিস্তানের মাধ্যমে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। আর যে মুসলিম লীগের পতাকাতলে তিনি নিজেই পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই বেশিদিন সম্ভবপর হবে না, এ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই শেখ মুজিব ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা প্রথম আক্রমণ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' তখন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তরুণ সমাজ প্রতিবাদে গর্জে উঠে। তৎকালীন পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল কায়দে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহর এমন অযৌক্তিক ঘোষণার প্রতিবাদে দেশজুড়ে শুরু হয় বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় তুমুল আন্দোলন।

স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের কল্যাণসাধন। পাকিস্তানি শাসকদের কুটিল মানসিকতা থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে বাংলার জনগণের মতো করে পরিচালিত করার কথা মাথায় নিলেন। আটষট্টি হাজার গ্রামবাংলায় ছিল তার স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন সম্ভার। ছাত্রজীবন থেকেই মুজিব ছিলেন ডানপিটে এবং একরোখা স্বভাবের। অসীম আকাশের মতো তাঁর বক্ষে ছিল সীমাহীন সাহস আর প্রতিবাদের অদম্য বাসনা। বীর বাঙালির প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর দেশপ্রেমের কাছে সব লোভ-লালসা ছিল পদানত।

১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঘোষণা করেন। এই বছর থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা তীব্রতর হয়। বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তিনি নিজের চেতনায় ধারণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে যখন আন্দোলন গড়ে উঠছে, বাঙালি জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি। ঢাকা সেনানিবাসে তাঁকে আটক রাখা হয়। সেই মামলায় দীর্ঘদিন কারাবন্দি রেখে ফাঁসি দেওয়ার প্রক্রিয়া করেছিল পাকিস্তানি জান্তা। কিন্তু লক্ষ্য থেকে একটুও বিচ্যুত করা যায়নি বঙ্গবন্ধুকে। ১৯শে জুন কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কার্য শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারে ২২শে ফেব্রুয়ারি সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে দশ লাখ মুক্তিকামী মানুষের পক্ষ থেকে জননেতা তোফায়েল আহমেদ উক্ত সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করার মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মনে সূর্যের আলোর প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্বলিত করেছেন, জাতিকে করেছেন আত্মসচেতন, জাগিয়েছেন জাতীয়তাবাদের বোধশক্তি, দিয়েছেন স্লোগান 'জয় বাংলা'। পাকিস্তানি জান্তার সমস্ত ষড়যন্ত্র বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বাংলার জনগণের প্রাণের মানুষে পরিণত হন তিনি। সেই সঙ্গে 'জয় বাংলা' দিয়ে বাঙালি জাতিকে একটি চেতনায়, একটি ভাবধারায় একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত

আহ্বান জানান। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে। ফলে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান, ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এ বৈঠকের বিরোধিতার কারণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেন। তারপরই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে হরতাল পালিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে জনরায়ে সমর্থিত আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর যৌক্তিক দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ৭ই মার্চ রেসকোর্স জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু আরো ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্'। দীপ্তময় আবেগ মিশ্রিত অলিখিত এ ভাষণটি তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধময়। ভাষণটি বাঙালির ইতিহাসের ক্ষুদ্র পরিসরে অসংখ্য ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে। ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনার সঠিক তথ্য উপস্থাপনের ফলে সমগ্র বাঙালি জাতি এক মুহূর্তে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। দিনে দিনে এভাবেই তিনি গণমানুষের প্রাণের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ভাষণটি হয়ে উঠেছিল শাণিত চেতনার এক ভয়ংকর মারণাস্ত্র– যা প্রতিটি বাঙালিকে নির্ভয়ে শত্রুর বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যেমন– 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...'। এই অনবদ্য ভাষণটির প্রতিটি বাক্যে ইতিহাসের নির্মম সত্য অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জাতির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষণের কোথাও ভাষার সামান্যতম কোনো জড়তা নেই, শব্দ চয়নে দক্ষ কবির মতোই প্রতিটি আবশ্যিক শব্দকে সাজিয়েছেন। যেমন: 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' তাঁর নিপুণ শব্দ চয়নে প্রিয় দেশবাসীর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে, তেমনি শত্রুদের প্রতি নির্ভেজাল ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষণের প্রতিটি শব্দ শান্তিকামী প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে। ভাষণটি শুনে প্রথমেই মনে হয় এটা শপথ প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধ সংগ্রামের ডাক, সমর কৌশল, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জাতীয় প্রত্যয়। এছাড়া দেখা যায়– অসাম্প্রদায়িক ও সুদৃঢ় মনোভাব, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিফলন।

একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন এ জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না, এবং কোনো পেশীশক্তি বা পরাশক্তির কাছে পরাজিত হবে না। বঙ্গবন্ধু যে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধেছিলেন বাঙালি জাতিকে সেই ঐক্য সাধনে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল মনোবল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শুধু অস্ত্রের লড়াই ছিল না, ছিল মনস্তত্ত্বের লড়াই, ছিল অনুভূতির লড়াই। এ লড়াইয়ের অমোঘ অস্ত্রটি বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর স্বদেশবাসী বাঙালির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বন্দি হওয়ার আগে তাঁর যে বার্তা সম্প্রচারিত হয়েছিল তারও প্রথম বাক্যই ছিল 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'। বাঙালি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে সক্ষম হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বাঙালিকে উপহার দিলেন– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', এই জাতীয় সংগীত। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেননি একইসঙ্গে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শুরু করলেন নতুন অভিযাত্রা। দেশ পরিচালনার জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি মূল স্তম্ভের ওপর একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিলেন। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রতীক হিসেবে গণমানুষের নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরল ভূমিকা আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। দেশ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল দুর্বৃত্ত সেনা কর্মকর্তাদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদতবরণ করেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় মন বলে ওঠে:

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে তোমার কীর্তি শেখ মুজিবুর রহমান'।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পতাকাগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ

কোনো কোনো দেশের জন্য পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়। এতে জড়িয়ে থাকে সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মত্যাগের করুণ কাহিনি। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ওই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশ। আরো রয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, নেপাল এবং মালয়েশিয়ার পতাকা। এতে বাংলাদেশের পতাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পতাকার রং সবুজ যা এ দেশের প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক। বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের রক্তের প্রতীক। ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এ নকশা সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেমন দেখেছি

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

১৯৬৪ সাল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র । বয়সের ভার কম হলেও বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান পরিসর ছিল প্রখর। দুষ্টুমিতে ছিলাম দুরন্ত দুর্বার। সব জানার আগ্রহ আমাকে টেনে নিয়ে যেত প্রতিটি পদে পদে। বাহির জগৎ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা আমাকে ব্যাকুল করে তুলতো। তাই যে-কোনো আনন্দঘন অনুষ্ঠানে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেতাম পিতা-মাতার অজান্তে। তখন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। প্রথমত তিনি সামরিক শাসক হিসেবে দেশকে পরিচালনা করলেও পরবর্তীতে মৌলিক গণতন্ত্র নামে রাজনৈতিক আদেশ জারি করে।

১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামের পথে নির্বাচনি প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের জন্য সারা পাকিস্তানব্যাপী ইলেকশনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ইলেকশনে যারা প্রার্থী হিসেবে দলভুক্ত হবেন তাদেরকে নমিনেশন প্রদান করে। এতে পাকিস্তান থেকে আগ্রহী হন ফাতেমা জিন্নাহ 'গোলাপ ফুল' মার্কায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রার্থীতা গ্রহণ করেন তৎকালীন বাঙালিদের প্রাণপুরুষ রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইলেকশনের ঢামাঢোল চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তার প্রগাঢ় উত্তেজনায় সারা পূর্ব পাকিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের কোনো এক সময়ে নির্বাচনের প্রচারণা প্রজ্বলিত করার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করেন। এ খবর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে জনমনে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

তালশহর রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ পাশে আমাদের গ্রাম নাওঘাট। রেললাইনের পাশে হওয়ায় তাঁদের আগমন বার্তা আমাদের গ্রামসহ আশপাশের সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাদেরকে দেখার জন্য উৎসুক মনে অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ করে তাঁদের সহকর্মী হিসেবে যিনি আসছেন তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণের প্রাণপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি ছিলেন পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশুল তরুণ রাজনৈতিক নেতা এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। দিনক্ষণ এবং তারিখ ঠিক হলো ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার। যে গাড়িতে উনারা আসবেন তা তালশহর স্টেশনে সকাল দশটায় এসে পৌঁছার কথা। গাড়ি স্টেশনে আসার পূর্ব থেকেই মানুষের একত্রিত হওয়ার ঢল নামলো। হাজারো হাজারো উৎসুক জনতা ব্যাপক উদ্দীপনায় তাকিয়ে আছে গাড়ির আগমনের দৃশ্য অবলোকনে।

আমাদের অঞ্চল অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পশ্চিম অঞ্চলে তখন আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন আমার পিতার ভগ্নিপতি (ফুফা) তালশহর গ্রামের আহম্মদ আলী। সকাল থেকেই তিনি আশপাশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আগত নেতাদের খোশ আমদেদ জানাতে নানা ধরনের সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। এতে আমার পিতা আব্দুল আউয়াল অংশগ্রহণ করেছিলেন। নেতাদের বহনকৃত গাড়ি দশটার মধ্যে পৌঁছার কথা থাকলেও দুই ঘণ্টা দেরিতে বারোটার সময় এসে পৌঁছালো। আমি বয়সে ছোটো হলেও স্টেশনের গাঁথানো পিলারের ওপর উঠে মালা পড়ানোর দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। সোহরাওয়ার্দী, ফাতেমা জিন্নাহ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে এক সাথে দেখে বিমোহিত হয়ে গেলাম। সুপুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব আপেলের মতো লাল ও দীর্ঘদেহী। যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র খচিত চেহারা। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিবুর রহমান লম্বাটে চেহারা মাথার চুল পেছনের দিকে উল্টানো, চোখে কালো চশমা, পড়নে সাদা পাঞ্জাবি। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তখনি জীবনের প্রথম বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের বক্তৃতা শুনতে পাই যা জনতাকে শিহরিত ও আন্দোলিত করে। তৎকালীন সময়ে গ্রামগঞ্জে উন্নতমানের তেমন খাবার ছিল না। তাই আহম্মদ আলী ফুফার বাড়ি থেকে পিঠা জাতীয় কিছু খাবার এবং ফল নিয়ে আসলেন যার পরিবেশনের দায়িত্ব পড়ল আমাদের ওপর। আপ্যায়ন পর্ব শেষ হলে স্লোগানে মুখরিত করে তাঁদেরকে গাড়ীতে উঠানো হয়। গাড়ী প্রায় ২০ মিনিট সময় অতিবাহিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাওয়ার মুহূর্তে আমি ও আমার সমবয়সি বন্ধুরা দৌড়ে গাড়ির একটি বগিতে উঠে পরি। কেননা এই দেখা যেন শেষ দেখা না হয়। তাঁদেরকে দেখতে হবে দুই চোখ ভরে বার বার। গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছলে দেখতে পেলাম স্লোগানে মুখরিত সহস্র মানুষের ভিড়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনের প্লাটফর্মে তাঁদেরকে গাড়ি থেকে নামানো হলো তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আলী আজম ও অন্যান্য নেতাগণ ব্রিজের ওপর নিয়ে স্টেইজে বসালেন। তখন ছিল মধ্য দুপুর মাথার উপর সূর্যের তীর্যক রশ্মি সঞ্চারিত হচ্ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান। নিচের প্লাটফর্ম থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পূর্ণ অবয়ব দেখা যাচ্ছিল । সোহরাওয়ার্দী তাঁর বর্ণিল কণ্ঠ দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীকে স্বাগত জানালেন। তাঁর পরে সুর মিলিয়ে দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার আবেগ জড়িত কণ্ঠে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীকে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ছায়াতলে আবিষ্ট করলেন। এমনি করে প্রায় ৩০ মিনিট সময় অতিবাহিত হলে উনারা উপর থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি প্লাটফর্ম থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় উদ্বেলিত জনতা হাত নাড়িয়ে তাঁদের সাধুবাদ জানালেন।

আবারো আমরা আগত কয়েকজন বন্ধু চলতি বগিতে উঠে পড়লাম। হাতে তেমন টাকাপয়সা ছিল না। কিন্তু মনে অনেক জোর তাড়না ছিল। কোনো ভাবেই নিজেকে স্থিমিত করতে পারছিলাম না। এ যেন নেশাখোরের মতো অবস্থা। গাড়ি আবার দ্রুত গতিতে ছুটতে আরম্ভ করল আখাউড়া রেল স্টেশনের দিকে। প্রায় আধা ঘন্টা পর আখাউড়া রেল স্টেশনে গাড়ি এসে থামল। সেখানেও একই দৃশ্যের অবতারণা। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে প্লাটফর্মে নামলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান ও ফাতেমা জিন্নাহ গাড়িতে বসে ছিলেন। অন্যান্য

সহযোগীদের সাথে নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন। মানুষ তা প্রাণ ভরে শুনল, উপলব্ধি করল। বক্তৃতা শেষে নিচে নেমে এসে আবারো অপেক্ষাকৃত গাড়িতে উঠে বসলেন। বহনকারী গাড়িটি ইতোমধ্যে কুমিল্লার দিকে রওনা হলে আমরা অনেকটা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কেননা তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে; বাড়িতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া হাতে বেশি টাকা না থাকার কারণে টিকিট কাটা ব্যতীত কিছু খাওয়ারও সুযোগ ছিল না। অতি কষ্টে ক্ষুধা পেটে রাতের গাড়িতে বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। তারপর দশ বছর পেরিয়ে গেল; সশরীরে আর কখনো শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে পাইনি। মাঝে মাঝে টেলিভিশনের বিভিন্ন খবরা-খবরে দেখতে পেতাম। ৭ই মার্চ-এর ভাষণ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখেছিলাম। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিশিখা সারা দেশব্যাপী প্রজ্বলিত হলো। শেষ অবধি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ফিরে পেলাম স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ফিরে আসেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। যাকে জীবনের প্রতি পদে পদে পাকিস্তানি শাসকগণ নির্মম অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়ন করেছেন। নিজ মাতৃভূমির বুকে ফিরে আসলে দেশ পরিচালনার সমস্ত ভার তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়। তিনি এদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা পরিবর্তন ও লাঘবের জন্য হাসি মুখে তা বরণ করে নিলেন। ১৯৭২ সালে আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে নতুন লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি হয়ে শান্তিনগরে মেজ ভাইয়ের বাসায় থাকি। হঠাৎ বন্ধুবান্ধব ছেড়ে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসে মন তেমন ভালো লাগছিল না। এরই মধ্যে বন্ধু নিছার পত্রের মাধ্যমে আমাকে জানালো আগামী মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লাবাসীকে স্বাগত জানাতে আসবেন; কুশল বিনিময় করবেন। আমি তার পত্র পাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লা আসছেন জানতে পেরে ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে পড়লাম। যে করেই হোক উক্ত মহাসমাবেশে আমাকে অংশগ্রহণ করতেই হবে। আমি অনীহা না করে অতি সত্তর কুমিল্লা চলে আসলাম। তৎকালীন সময়ে আমার মেজ বোনের স্বামী আনোয়ার হোসেন কুমিল্লা আদালত পাড়ায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারী। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল তার ভীষণ অনুরাগ। আমি যেহেতু ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলাম তাই আমার আন্তরিক টানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে বিধায় দু'দিন পূর্বেই সহযোগী বন্ধুদের সাথে মিশে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল শাকতলা পার হয়ে পুরাতন এয়ারপোর্টের উত্তর পাশের খালি মাঠে বর্তমানে যেখানে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। মাঠের মধ্যে মঞ্চ, পেন্ডেল ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য আমরা কয়েকজন বন্ধু-সহপাঠী মিলে আগের দিন থেকেই সেখানে অবস্থান করতে ছিলাম। বন্ধুদের মধ্যে ছিল ছোটরা গ্রামের নিছার, জাহাঙ্গীর, কাশেম, জাহান, শহীদ, শাহজাহান, কেনু মিঞা, ফয়েজ, আমি, শাহজাহানসহ অন্যান্যরা। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে কুমিল্লার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিলেন আফজাল খান। সে শুধু নেতা নয়,সারা কুমিল্লাজুড়ে তার সাহসিকতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। আফজাল খানের ছোটো ভাই হিম্মত ছিল আমার সহপাঠী। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির ভার নিয়েছিলেন আফজাল খান। সুতরাং প্রতিটি কাজকর্মে সহযোগিতা করার জন্য তার নির্দেশ আমাদেরকে শুনতে হয়েছে। মাঠের দক্ষিণ পাশে ছিল বড়ো আকারের সার্কিট হাউজ। সার্কিট হাউজ-এ আগত নেতা ও আমলাদেরকে দুপুরের খাবার পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছিল।

বেশ কিছু সময় পার হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হেলিকপ্টার যোগে তাঁর সহযোগী তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যদের নিয়ে কুমিল্লা এসে পৌঁছলেন। হেলিকপ্টারের আগমন ও শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে পেয়ে মাঠের উপস্থিত জনতার বিভিন্ন স্লোগান ও করতালিতে আশপাশের পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। মাঠের উত্তর পাশের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। শেখ মুজিব দৃপ্ত পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মঞ্চে উপবিষ্ঠ হলেন। স্পন্দিত উৎসুক কুমিল্লাবাসী তখন ও তাঁর প্রতি করতালি দিয়ে বরণ করে নিলেন। মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা অথাৎ সহপাঠীগণ উপবিষ্ট সকলের প্রতি লক্ষ রাখছিলাম। জনতার উদ্দেশ্যে প্রথম শুভেচ্ছা বিনিময় ও বক্তৃতা রাখেন তাজউদ্দীন আহমেদ, পরবর্তীতে বক্তৃতা করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা। অতঃপর জনতার প্রাণস্পন্দিত নেতা বাংলাদেশের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চঁশমা হাতে উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বুকে পুষে রাখা আবেগ সঞ্চারিত করে অগ্নিদীপ্ত কণ্ঠে ভাষণ শুরু করলেন। তাঁর মোহনীয় বক্তৃতা জনস্রোতে মিশে গিয়ে চারদিকে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত মাঠ নীরব নিস্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শ্রুতিমধুর বক্তৃতা ও আখ্যায়িত ভাষণ শুনে যেন সবার হৃদয়ে জেগে উঠেছিল অনাবিল আনন্দ ও উল্লাস। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসিত হচ্ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান। বিকেলে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা কয়েকজন বন্ধু ও আফজাল খানের ভাই হিম্মতসহ রেস্ট হাউজে চলে আসি ঢাকা থেকে আগত নেতাবৃন্দ ও বঙ্গবন্ধুকে খাবার পরিবেশন করার জন্য। সৌভাগ্যক্রমে আফজাল ভাইয়ের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব ভার বর্তালো আমার ও হিম্মতের ওপর। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এজন্য যে, জীবনে যেটা ভাবিনি আজ তা হতে যাচ্ছে। মনে তখন কিছুটা ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। কেননা আমি কোনো ভুল বা বেয়াদবি করে ফেলি কিনা। আমি বড়ো কোনো প্রকার ব্যতিক্রম করেনি। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে তাদের খাবার পরিবেশন করেছিলাম। আপ্যায়নের প্রায় ৩০ মিনিট পর বিশ্রাম নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবর্গ ঢাকায় চলে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। হেলিকপ্টার অনতিদূরে অপেক্ষা করছিল। বঙ্গবন্ধু ও তার সহকর্মীগণ আমাদেরকে খোস আমদেদ জানিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে চলে গেলেন। আবার হাজারো জনতা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে মুখরিত করে হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় দিলেন।

১৯৭৪ সাল, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র থাকার সময় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা হতে যাচ্ছে। আমি ও আমার বন্ধু কয়েকজন মিলে উক্ত মেলায় একটি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট দেওয়ার মনস্থ করি। আমার অন্যান্য বন্ধুরা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেক্ট-এর ছাত্র। মেলা আরম্ভ হবে ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে দুই মাসের জন্য। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা স্টলের জন্য দরখাস্ত করলে একটা স্টল আমাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিলে একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলের নাম রাখা হয় 'আজ এখানে'। আমি ছিলাম হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কমিটির সেক্রেটারি। মেলা উদ্‌বোধন করেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুকে ফুলেল শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আমি যেহেতু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং জেনারেল সেক্রেটারি তাই সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর গলায় ফুলের মালা পড়ানোর দায়িত্ব আমাকে দিলো। তিনি সকাল দশটায় উদ্‌বোধন করার জন্য আসলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিবর্গ নিয়ে মাঠে আগমন করলে আমি পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফুলের শুভেচ্ছা ও ফুলের মালা পড়িয়ে তাঁকে বরণ করে নিলাম। আমি তার সংস্পর্শে এসে খুশিতে আত্মহারা এবং বিমোহিত হয়ে গেলাম।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিয়েছিল বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে। যে ক্ষত কোনোদিন পূরণ হবার নয়। আজ এত বছর পরে এসে সে দিনের অকৃত্রিম দৃশ্যপট ও বঙ্গবন্ধুর সচিত্র অবয়ব আমাকে ভীষণভাবে শোকবিহ্বল করে। আমি তাঁর বিদায়ের করুণ বাঁশি হাতে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি।

উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী ফিরোজ আহম্মেদ এবং আমি ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬টি দুর্লভ ছবি বাঁধিয়ে ৩টি ছবি ফিরোজ ভাই ও ৩টি ছবি আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করি। প্রধানমন্ত্রী ৬টি ছবি হাতে পেয়ে আমাদের দুজনকে আগলে ধরেন এবং ধন্যবাদ দেন।

লেখক: কলামিস্ট

নিবন্ধ

বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু

শামসুজ্জামান শামস

পৃথিবীতে কোনো জাতিই মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর এক তেজোদীপ্ত ভাষণেই উদ্বুদ্ধ গোটা জাতি সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। তিনি না হলে আর কত বছর পরে কে স্বাধীনতা আনতো তা কেউই বলতে পারে না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বভাব নেতা। কি বাল্যে কি কৈশোরে কি মত্ত যৌবনে সবখানেই ছিলেন তিনি এক কালজয়ী মহাপুরুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, আরো শত শত বছর বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শিকল পরে মৃত্যুর যন্ত্রণায় দিন কাটাতে হতো। কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা। বঙ্গবন্ধু কোনো দিন পাকিস্তানিদের কাছে মাথা নত করেননি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে যেদিন গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেদিনও তিনি ছিলেন অনমনীয়। তাকে জেলগেটের ছোটো দরজা দিয়ে বের হতে বললে তিনি রাজি হননি। পুরো দরজা না খুললে তিনি বের হবেন না, কারণ শেখ মুজিব মাথা নিচু করতে জানেন না। ছোটো গেট দিয়ে বের হতে হলে মাথা নিচু করতে হয়। এটা যে তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ এই বাংলাদেশের গোপালগঞ্জস্থ অজপাড়াগাঁ টুঙ্গিপাড়ায় যেদিন শেখ মৌলবি লুৎফর রহমানের ঘর ও বেগম সাহেরা খাতুনের কোল আলো করে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেদিন কেউ কি জানতো যে, এই শিশুই বাংলার ভাগ্যাহত দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুক্তির দূতরূপেই আবির্ভূত হবেন একদিন। ব্রিটিশ যুগে শৃঙ্খলিত বা পরাধীন বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে জন্মগ্রহণ করেও পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের বাঙালিদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিশারীরূপে শেখ মুজিবুর রহমানের অভ্যুদয় ঘটেছিল জনগণের হয়ে অকুতোভয় আপোশহীনভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়াই সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় গ্রামের বিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন এক দীর্ঘদেহী মানুষ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশিত হতে থাকে। শৈশব, কৈশোরেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর বিপ্লবের জীবন। রাজনৈতিক ২৩ বছরের মধ্যে ১২ বছরের বেশি সময় কারাগারে ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের নেতা। যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও মুক্তি চেয়েছেন তাদের মনের আশার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্কুলে পড়াকালেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও প্রতিবাদী। পাশাপাশি ছিল মানুষের জন্য মমত্ববোধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, মাত্র ৫৫ বছরের (১৯২০-১৯৭৫)। তার মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আনুমানিক ৩৭ বছর– মুক্তিযুদ্ধের আগে প্রায় ৩৩ বছর আর মুক্তিযুদ্ধের পর– ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন বছর (১৩১৪ দিন)। ১৯৭২-এর মহান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ৪০ শতাংশ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে কাটিয়েছেন। আর ৪৮ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠন গড়ে তোলাসহ মাঠের আন্দোলন-সংগ্রামে, ঘুমিয়েছেন মাত্র ১২ শতাংশ সময় (দিনে গড়ে ৩-৩.৫ ঘণ্টা)। কারণ একটিই তাহলো নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে ছিলেন অনড়-অটল-অবিচল বিশ্বস্ত।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনো ভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়হিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এসব কারণেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হয়েছিল। পুরো ময়দান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয় । এই জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন,

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

৭ই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার একাংশ –ফাইল ছবি

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম– আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? জামার (আমার) পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল করফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

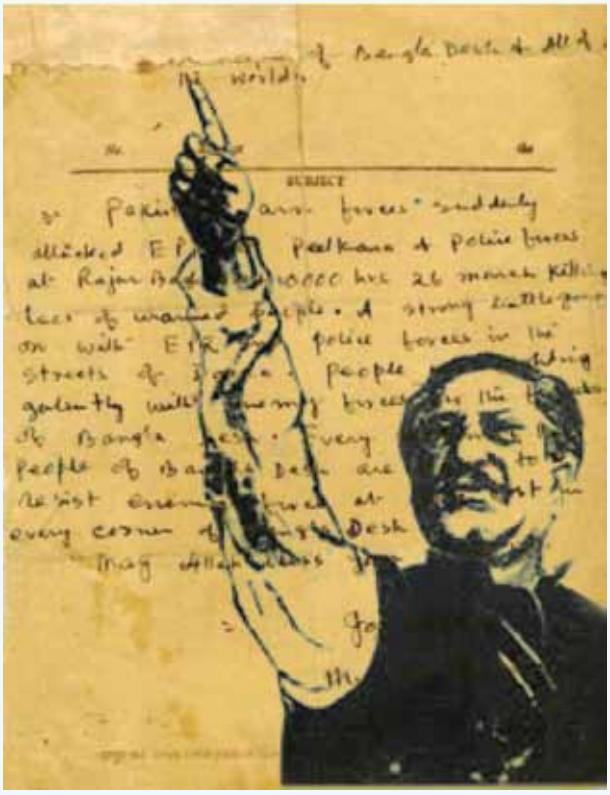

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইদড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়– হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইন্‌শাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রাতে পাকিস্তানের হিংস্র বাহিনী বাংলার মানুষের ওপর যে তাণ্ডব চালিয়ে ছিল তা পৃথিবীর যে-কোনো সভ্যতাকে লজ্জায় ডুবায়। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় ভারতের আগরতলায় ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে জলে, স্থলে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাসের পর মাস যুদ্ধ করতে থাকে। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সর্বক্ষেত্রে মার খেয়ে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের, ২রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারত ও তার যথোপযুক্ত জবাব দেয়। বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদারবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানবাহিনীর

যৌথবাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা থেকে শুরু করে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পূর্বদিন পর্যন্ত দেশের গণমানুষের উন্নয়নের কথা বলেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল তার রাষ্ট্রনীতি। তিনি সবসময় শোষিতের মুক্তি কামনা করেছেন। আজীবন সংগ্রামে যেমন তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, তেমনি স্বাধীন দেশের সমাজকে সকল অপশক্তির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল তার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

ঘাতকরা যুগে যুগে, দেশে দেশে মহৎ ও সরলপ্রাণ ব্যক্তিদের উদারচিত্ততার সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকে। ঘাতকরা ১৯৪৮ সালে ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে প্রার্থনাসভায় প্রবেশকালে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বারবার নিরাপত্তা দিতে চাইলেও মহৎপ্রাণ গান্ধীজী তা গ্রহণ করেননি। আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মার্টিন লুথার কিংকে ১৯৬৮ সালের ৩রা এপ্রিল দুর্বৃত্তরা হত্যার হুমকি দেয়। কিংয়ের সহকর্মীরা তাকে অন্যত্র চলে যেতে পরামর্শ দেন। কিন্তু নির্ভীক লুথার কিং কিছুতেই সেখান থেকে গেলেন না। বরং সবাইকে হিংসা ত্যাগ করার অনুরোধ জানালেন। পরদিনই আততায়ীর বন্দুকের গুলিতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ১২ই জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিনই সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত হয়, রমনা গ্রিনের যে প্রেসিডেন্ট হাউসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা চালিয়েছিলেন, সেই ভবনটিকেই প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে রূপান্তরিত করা হবে। কিন্তু কালবিলম্ব না করে উদারচিত্ত ও সরলপ্রাণ বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি সরকারি ভবনে বাস করবেন না, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের নিজ বাড়িতেই থাকবেন। এদেশে কেউ তাঁকে খুন করতে পারে এমন দুর্ভাবনা বঙ্গবন্ধুর মাথায়ই ছিল না।

আপামর জনসাধারণের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ইতিহাসের বাঁকঘোরানো এক সিংহ পুরুষ। জীবনের বিনিময়ে তিনি সেই জাতির জন্যই রচনা করেন ইতিহাসের এক অমোঘ অধ্যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্ক লেপণ করেছিল সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সদস্য। ঘাতকের নির্মম বুলেটে সেদিন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ঐতিহাসিক ভবনে শাহাদতবরণ করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওইদিন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও তাদের পত্নী যথাক্রমে সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল এবং বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের আরো ২৮ সদস্য। একই দিন ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারান বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শহীদ সেরনিয়াবাত, শিশু সুকান্ত বাবু, আরিফ, রিন্টু প্রমুখ। ঘাতকরা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সব সদস্যকেই হত্যা করে। কিন্তু মহান আল্লাহর অপার করুণায় দেশে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোটো বোন শেখ রেহানা। ঘাতকরা সেদিন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরই কেবল হত্যা করেনি, বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে পরিবারের সদস্যসহ এমন ভয়াবহভাবে হত্যার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর গোটা বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প। জাতির পিতাকে হারানোর সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা। রক্তের ভেতরেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি শেখ হাসিনার। রাজনীতিতে নামার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। পিতা জাতির মুক্তিদাতা। স্বাধীনতার স্থপতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর কন্যা। এ পরিচয়ই তো অনেক বড়ো। এ পরিচয়েই তারা পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। শোকের সাগর মাড়িয়ে তাকেই কিনা হাল ধরতে হলো ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণের।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একাত্তরে, দেশ স্বাধীন করতে, স্বাধিকার রক্ষায়। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছিল মহার্ঘ স্বাধীনতা। আবার সেই স্বাধীন ভূমিতেই জাতির পিতাকে খুন হতে হলো কিছু ক্ষমতালোভী স্বাধীনতাবিরোধী পাপিষ্টের হাতে। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। কিন্তু বাঙালি জাতির হৃদয়ের আসন থেকে সরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু যে সেখানে অমর, অক্ষয়, অবিনশ্বর। শত অপচেষ্টা করেও বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠা থেকে কি তাকে আলাদা করা গেছে? ছড়ায় বঙ্গবন্ধু, কবিতায় বঙ্গবন্ধু, গানে বঙ্গবন্ধু। শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, পালাগান কোথায় নেই বঙ্গবন্ধু? বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ ও বাঙালি যতদিন থাকবে, বঙ্গবন্ধুও ততদিন বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন স্বমহিমায়।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

আগস্টের শোক শক্তিতে রূপান্তর হোক

বরুণ দাস

মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারি বান।

'বঙ্গবন্ধু' আর 'বাংলাদেশ'– আমাদের সকলের অন্তরে শব্দ দুটি যেন অনেকটা সমার্থক। আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের কথা যখন বলা হয়, মনের আয়নায় তখন জেগে ওঠে বাংলাদেশের সবুজ পতাকা। আর তার মাঝের লাল সূর্যের ভেতর থেকে যেন জেগে ওঠে আলোকিত এক পুরুষের মুখচ্ছবি। তিনি বাঙালির স্বাধীনতা এবং মুক্তির প্রতীক। তিনি বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি আমাদের স্বপ্নের রূপকার এবং নতুন স্বপ্নের নির্মাতা। তিনি আর কেউ নন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

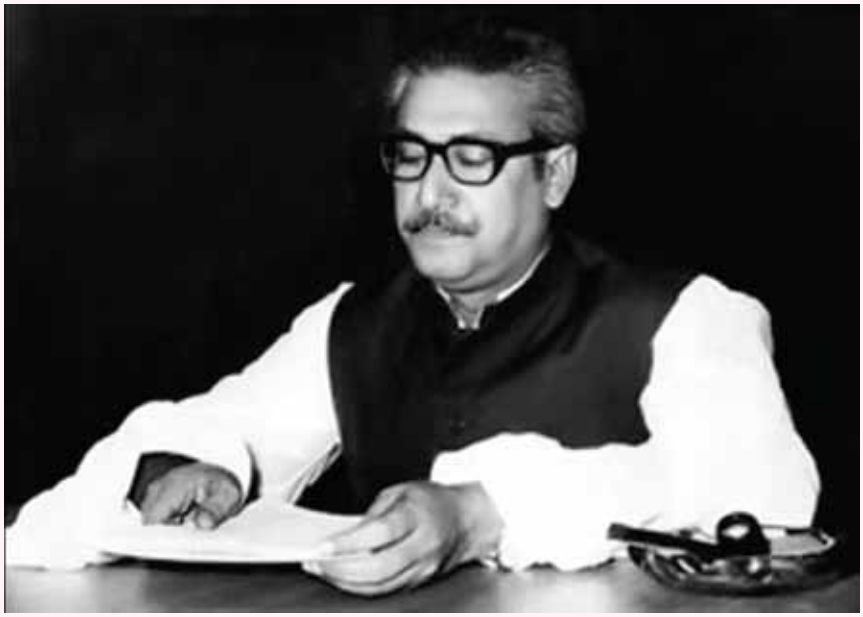

১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছেন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে অভিহিত, যিনি বাঙালির স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার স্থির লক্ষ্যে অবিচল থেকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন, কোথাও মাথা নত করেননি, আপোশ করেননি। তিনি আর কেউ নন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস যেমন নায়ক সৃষ্টি করে, তেমনি নায়কও কখনো কখনো ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধু তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন একাধারে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বোপরি একজন সম্মোহনী নেতা।

শেখ মুজিব শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি একইসঙ্গে একজন দেশনায়কও বটে। বাঙালি হওয়া যে গৌরবের বিষয়, এই বোধ বঙ্গবন্ধুই জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে। তিনি তাঁর সংগ্রাম আর ত্যাগের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালিদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ তিনি কখনো করেননি, ভাবেননি কিংবা ভাবনায়ও আনেননি। তিনি আমাদের একটি মানচিত্র, একটি দেশ উপহার দিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মডেল তুলে ধরে সমগ্র বিশ্বে আমাদের গর্বিত জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। আর তাইতো দিকে দিকে উচ্চারিত হয়–

মুজিব মানে বঙ্গবন্ধু
যে চেতনার নেইকো শেষ
সেই চেতনার অগ্নিমশাল
মুজিব মানেই বাংলাদেশ ॥

সত্যিই তাই। তাঁর চেতনার যে অগ্নিমশাল তিনি প্রজ্বলিত করেছেন সেই আলোয় তিনি সংকটের চরম মুহূর্তে স্থির ও অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। তাইতো তিনি জাতীয় নেতা থেকে 'জাতির পিতা' হতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলার আপামর মানুষের নেতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান যে 'বঙ্গবন্ধু' হলেন তা কিন্তু একদিনে হয়নি, কিংবা রাতারাতিও হয়নি। একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব সরকার মুজিবুর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় বিনা শর্তে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তাঁর কারামুক্তির পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত, সেখানে ছাত্র-জনতা এক বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। লাখো জনতা হাত তুলে করতালি ও মুহুর্মুহু স্লোগানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, যে-কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে তৈরি নয়, তারা জীবনে কোনো ভালো কাজ করতে পারে না। আর সেই বিশ্বাস ছিল তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। তাইতো তিনি আমাদের জাতির পিতা, অবিসংবাদিত এক মহান নেতা। ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বাধা-বিপত্তি, ভয়ংকর অর্থকষ্ট, পুলিশের নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা সবকিছুকে সামাল দিয়ে কীভাবে একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হয় বঙ্গবন্ধু তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই নিঃসংকোচে আমরা উচ্চারণ করতে পারি– তুমি ছিলে তুমি আছো...জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

হে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু
তোমার তুলনা তুমি
এই বাংলার মাটির সাথে মিশে
হয়েছো মাতৃভূমি
তোমার তুলনা তুমি।

['হে মহানায়ক' শীর্ষক কবিতার অংশ বিশেষ; রচনা- তোফাজ্জল হোসেন]

সত্যিই তাই। তাঁর মতো মানুষের তুলনা চলে না অন্য কারো সাথে। এ নাম যে আমাদের সবার প্রিয়; বড়ো প্রিয় এই নাম...। বাহান্নর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ের যে ধারা সূচিত হয়, সে লড়াই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে বাঙালি জাতির মুক্তির লড়াইয়ে রূপ লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই বাংলার কৃষক, মেহনতী জনতা সার্বিক

মুক্তির পথটি খুঁজে পেতে চেয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের চাহিদা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে শুধু উপলব্ধিই করেননি, এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথও তিনি রচনা করেন। তিনি জনগণের মূল আকাঙ্ক্ষাটি সঠিকভাবে চিনতে কখনই ভুল করেননি। কারণ তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিসত্তার বিষয়ে আমাদের গর্ববোধ করতে শিখিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মডেল তুলে ধরেছেন যা থেকে অনেক দেশই শিক্ষা নিতে পারত।

শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে মাত্র দুজন জীবিত নেতার নামে তোরণ হয়েছিল– একজন মার্শাল টিটো এবং অন্যজন বাংলার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি বলেছিলেন– 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'। জাতিসংঘে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার পর বিপুল করতালি পেলেন। তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার বললেন, 'তুমি শুধু বাঙালি জাতিরই নেতা নও। এমন দিন আসবে যেদিন তুমি তৃতীয় বিশ্বে সমগ্র নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব দেবে।' জুলিয়াস নায়ারের সেই কথা সত্যি হতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি। শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ইতিহাসের সেইসব বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যাঁরা চরম নির্যাতনের মধ্য দিয়েও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে এগিয়ে গেছেন, স্পর্শ করেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষ, অর্জন করেছেন চূড়ান্ত বিজয়।

আজ পনেরো আগস্ট
আজ বাঙালির শোক
অনার্য পতাকা হয়ে
বাংলার আকাশটাও আজ
নত হোক।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের উপস্থিত অন্যান্য সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতো না, যতি না আমরা পেতাম শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মহান, প্রতিভাবান এবং ত্যাগী নেতা। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সিংহভাগ সময়জুড়ে আছেন তিনি। আর তাইতো বছর ঘুরে এমন দিন এলে, প্রতিটি মুহূর্তেই আমাদের মনে পড়ে তাঁর কথা, তাঁর স্মৃতি আর তাঁর মহান আত্মত্যাগের হাজারো গল্প-কথা। এক মহানায়কের আদর্শের মূলে তার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রস্থানের যে আঘাত তা শুধু বাঙালি জাতি নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে করেছে হতবাক। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু সত্যিকারের মৃত্যু নয়। তিনি আছেন আমাদের অস্তিত্বে আর প্রেরণায়। নিহত হয়েও বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন মানুষের স্মৃতিতে এবং হৃদয়ে। বেঁচে থাকবেন ইতিহাসের সৃষ্টি এবং স্রষ্টারূপে। কারণ তাঁর স্মৃতি যে আমাদের প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ে আজও সূর্যের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কালজয়ী অধ্যায়। এই দেশ ও এই ভূখণ্ড যতদিন থাকবে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় যতদিন স্রোতধারা বহমান থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হবে এর সর্বত্রই, সবখানে। কারণ বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক অবিচ্ছেদ অধ্যায়।

বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে তবু জাগ্রত চিরদিন
স্বাধীন পতাকা যতদিন রবে বাংলায় উড্ডীন ॥

[তোফাজ্জল হোসেন-এর কবিতা হে মহানায়ক থেকে]

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিত্রায়িত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কারণেই। বিশ্বসভায় বাঙালি জাতির সগর্ব উপস্থিতিই স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুকে। এ অবিভাজ্য অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি নেই। তাই তো কবি লিখেছেন–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় যে উন্নয়ন ধারা এখন বইছে তাকে সচল ও চলমান রাখতে হবে আমাদের সবাইকে মিলে। তাই জাতীয় শোককে শক্তিতে পরিণত করে সমগ্র জাতিকে এগিয়ে যেতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

উক্তি

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন?

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলার সম্মান

কথা ও সুরঃ ড. খান আসাদুজ্জামান

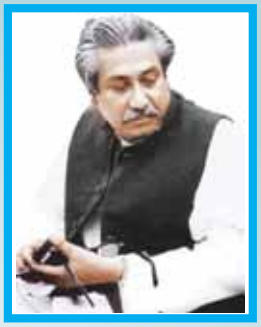

জাতির পিতার কন্যা তুমি
শেখ হাসিনা নাম
পিতার মতই নামী তুমি
টুঙ্গিপাড়ায় ধাম।

পিতার স্বপ্ন তোমার চোখে
আন্‌লে দেশে সাড়া
বিদ্যুৎ দিলে শহর গঞ্জে
গাঁও-গেরাম আর পাড়া।

ফ্লাইওভার মেট্রোরেলের
হুলুস্থুল সব কাণ্ড
এখন আর কেউ কয়'না তো
তলা বিহীন ভান্ড।

নদীর উপর সটান সেতু
ডিজিটালি দেশ
দেশবাসি আজ পাচ্ছে সেবা
লাগছে মজা বেশ!

মুক্তিযোদ্ধা পেলো সম্মান
বয়স্ক'রাও আছে
বিধবা'রাও নেই পিছিয়ে
স্বস্তিতে তাই বাঁচে।

ক্ষুধা মুক্ত দেশ আজিকে
খাদ্যের অভাব নাই
যেখানে যাই উন্নতির সব
ছোঁয়া দেখতে পাই।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন মোদের
নয়কো অলীক কিছু
গর্বিত বাঙালি মোরা
নইকো কারো পিছু।

সেনা পুলিশ গ্রামপুলিশ আর
বিজিবি আনসার
ছাত্র জনতাও আছে সঙ্গে
গুণে মুগ্ধ তোমার।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যুগ
সম্প্রীতিতে ধর্ম
মাদক জঙ্গি-মুক্ত দেশ আজ
তুমি মোদের বর্ম।

রোহিঙ্গাদের ঠাঁই দিয়েছো
মানবতার মা
জয় করেছো নীল-জলধি
বিশ্ব জানে তা।

এওয়ার্ড পেলে বহুবিধ
বিশ্বজনীন মান
পেলে সম্মান ডক্টরেট
তুমি, বাংলার সম্মান ॥

লোকান্তরিত মুজিব– শোক থেকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও জাতীয় মুক্তি

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

মুজিব শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, তিনি আমাদের আদর্শ। তিনি বাংলার মুক্তিকামী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, সুহৃদ এবং সঠিক পথের দিশারী। পৃথিবীর যে সকল নেতা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন, যাঁদের গৌরবগাথা ইতিহাস রয়েছে, যাঁদেরকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকেন, মুজিব ঐ সকল নেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর নেতৃত্বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে আমরা লাল-সবুজের পতাকা পেয়েছি। মুজিব সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, উদার ও বিশাল হৃদয়ের একজন সাহসী বিপ্লবী নেতা ছিলেন। মুজিবের জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। মুজিবের আদর্শ নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ গবেষণা করবে– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা সঠিকভাবে তাঁকে উপস্থাপন করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস/পটভূমি আলোচনা করতে হলে পেছনে ফিরে যেতে হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিপ্লবী নেতারা কখনো ক্ষমতার লোভী হন না, আরাম-আয়েশের ধার ধারেন না, তাঁদের মনপ্রাণ, দেহ, মস্তিষ্কে মানুষের কল্যাণসাধন করাই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন তিনি হলেন মুজিব। মুজিব সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের মনের মাধুরীতে যে উপলব্ধি রয়েছে তাহলো– একটি শিশু যখন মায়ের উদরে জন্মগ্রহণ করে তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে, শিশু থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, আর যৌবন থেকে বৃদ্ধে। ঠিক তেমনই একটি বৃক্ষের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব– প্রথমে মাটিতে বীজ রোপণ করতে হয়, তারপর বীজ থেকে চারা গজায়, চারা থেকে গাছ বড়ো হয়, তারপর ফল ধরে, এরপর ফল খাওয়ার উপযোগী হয়। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস ঠিক একই প্রক্রিয়ায় হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, যা লিখে শেষ করা যাবে না, ঐতিহাসিকভাবে সত্য বন্ধবন্ধু ১৯৬৬ সালে ৬ দফার মাধ্যমে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। অনেক সাধনার পর গাছ গজিয়েছিল, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলন, ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচন ছিল সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন, জনগণের ম্যান্ডেট। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনে মুজিবের দল জয়লাভ করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্র/চক্রান্ত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগবে নির্বাচনে জয়ী হয়েও মুজিবের দল কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না? সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানিরা কি অপরাধ করেছিল? তাহলে নির্বাচনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? নির্বাচন তো ঘোষণা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। চরম ঝুঁকি ও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুজিব সামরিক আইনের মধ্যেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচনে বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছিল, ঐ নির্বাচন পর্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় আইনগতভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকারী হয় পূর্ব পাকিস্তানিরা বা মুজিবের দল। আইয়ুব খান নানা বিতর্কিত কাহিনির জন্ম দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে যদি দেশ শাসন করতে পারেন তবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিতরা কেন দেশ পরিচালনা করতে পারবে না? বাঙালিরা কি অযোগ্য ছিল? 'অবশ্যই নয়' বরং বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে সুশৃঙ্খল, মেধাবী ও সাহসী জাতি ছিল, আজও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। মুজিবসহ অনেক নেতাই পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ও সাংসদ ছিলেন। মুজিব দেশ এবং জনগণের স্বার্থে সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) কারাবরণ

করেন। তিনি এ পর্যন্ত ১৯ বার কারাবরণ করেন। ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান ও ভুট্টো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন এবং তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ থেকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ লাখো লাখো মানুষের উপস্থিতিতে রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, উক্ত ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের কম্পন সৃষ্টি হয় ও শাসকগোষ্ঠী বেসামাল হয়ে পড়ে। মুজিবের ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনতা উত্তাল হয়ে পড়ে এবং জনবিস্ফোরণ ঘটে। এ শক্তির মূল উৎস ছিল ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৬শে মার্চ শুরু হয়নি, শুরু হয়েছিল আরো অনেক আগে থেকে। পর্যালোচনায় দেখা যায়– স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের গৌরবগাথা ইতিহাস। ২৫শে মার্চের আগে কী

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (সাবেক রেসকোর্স ময়দান) স্থাপিত স্বাধীনতা স্তম্ভ

ঘটেছিল, স্থিরচিত্রসহ অনেক দুর্লভ ছবি কালের সাক্ষি হয়ে আছে। ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদেশেই এদেশের অফিস-আদালত-কলকারখানা-ব্যাংক-বীমা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু মুজিব' পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুক্তিকামী মানুষের নিকট পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া বঞ্চনা ও অবজ্ঞার ইতিহাস পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান ও স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পেরেছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু একটি সাধারণ ভাষণ ছিল না। ৭ই মার্চের ভাষণ নতুন প্রজন্মকে মনোযোগ সহকারে উপলব্ধি করতে হবে এবং ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য নতুন প্রজন্মকে অবগত করাতে হবে। ৬ দফার মধ্যে কী ছিল, ১১ দফার মধ্যে কী ছিল, কত তারিখে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল, কতটি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল, কারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, কীভাবে পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্র করেছিল, কীভাবে লাখ লাখ মানুষের রক্ত ঝরেছিল, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং বীরঙ্গনা মা'দের ইতিহাস তা অনেকেই জানেন না। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলাকে কেন মুজিবনগর নামকরণ করা হয়েছিল। ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল বিপ্লবী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক অভিবাদন গ্রহণ, কোন বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে অভিবাদন প্রদান করেছিল, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ, দিক নির্দেশনা প্রদান, এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, বর্বর বাহিনীর হাত থেকে কীভাবে জনসাধারণকে রক্ষা করা যায় এবং প্রিয় মাতৃভূমিকে কীভাবে হানাদারবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা যায় এবং কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতিহাসের পাতায় ঘটনাবলি সংরক্ষিত আছে। স্বাধীনতা ও রক্তঝরা দিনগুলোর ইতিহাস স্মরণ করলে নির্দ্বিধায় বলা যায়– 'What Bengali thinks today, India thinks tomorrow.' এ বাক্যটি মুজিবের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাই মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গান রচিত হয়েছিল। এরমধ্যে ১. আমার সোনার বাংলা, ২. ও আমার দেশের মাটি, ৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, ৪. শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি... বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গানগুলো বলে দেয় হঠাৎ করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়নি। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা। বাঙালিরা হলো গর্বিত জাতি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাঙালিদেরকে কেউ কোনোদিন দাবায়ে রাখতে পারবে না। সত্যি তাই শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘৃণ্য চক্রান্তে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে তারা চেয়েছিল। মুজিব পরপারে কিন্তু তাঁর আদর্শ চির অম্লান ও অমলিন হয়ে আছে। লোকান্তরিত মুজিব অনেক বেশি শক্তিশালী– সে কথা সেই ঘৃণ্য চক্র সেদিন বুঝতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের ঝাণ্ডাকে বয়ে নিয়ে ১৬ কোটি জনগণের এই বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ হবে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাময় দেশ– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক: সাবেক উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাঙালির রাজনীতি, শোক ও শক্তির সূতিকাগার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

কে সি বি তপু

বাংলাদেশ ও বাঙালির সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী শোকের দিন ১৫ই আগস্ট– যা ঘটেছিল বাঙালির রাজনীতি, শোক ও শক্তির সূতিকাগার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর রোডের যে বাড়িতে বসবাস করেন, সে বাড়িটি বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালির স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত এ বাড়ি ছিল বঙ্গবন্ধুর অসম্ভব প্রিয়। এখান থেকেই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এখানেই ঘটেছে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস, হারানোর মর্মভেদী বেদনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল বিশ্বাসঘাতক খুনিদের হাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের এ বাড়িতে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর এ বাড়িই 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়– যা বাংলাদেশকে স্বীয় পথে এগিয়ে যেতে নিরন্তর অনুপ্রেরণার তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি ইতিহাস। তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। সংগ্রামের মধ্যেই তিনি বড়ো হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছাত্র অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ৬ দফার প্রণেতা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নপূরণে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাক হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপুরুষ বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি এই 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

উল্লেখ্য, বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। তিনি সাংগঠনিক কাজে দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই সংসার বাড়িঘরের খোঁজখবর রাখা তাঁর পক্ষে খুব একটা সম্ভব হতো না। সংসার সামলাতেন তাঁর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১৯৫৭ সালের ২১শে মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে দলীয় সদস্যদের সাংগঠনিক পদ অথবা মন্ত্রিত্ব দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলের সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করার জন্য সাধারণ সম্পাদকের পদ বেছে নেন।

১৯৫৬ সালে বেগম মুজিবের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর একান্ত সচিব নূরুজ্জামান ধানমন্ডি এলাকায় জমির জন্য গণপূর্ত বিভাগে আবেদনপত্র জমা দেন। ১৯৫৭ সালে ছয় হাজার টাকায় ধানমন্ডিতে এক বিঘার জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিব পরামর্শ করে বাড়ি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং একই সালে বাড়ির কাজে হাত দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।

১৯৬২ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম উত্তাল দিনগুলোতে তিনি এ বাড়িতে বসেই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

২৩শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডি ৩২নং রোডের নিজ বাড়িতে উচ্ছ্বসিত জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলেন

নিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন মিটিং এখানেই করতেন তিনি।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদারবাহিনী অপারেশন 'সার্চ লাইট' নামে নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে হত্যা ও গণহত্যা চালায়। এ খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু এই বাড়ির নিচ তলায় তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে টেলিফোনে রাত ১২.৩০ মিনিটে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন– যার যা কিছু আছে তা নিয়ে পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর ওয়্যারলেস ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই বাড়ি থেকেই ২৫শে মার্চ রাত ১.৩০ মিনিট তথা ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাস ও পরে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের মিওয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে।

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বাড়ির মেরামত কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবার নিয়ে সরকারি বাসায় না উঠে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এ বাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এ বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন করে বঙ্গবন্ধু যখন স্বপ্নের মতো সাজাচ্ছেন মাতৃভূমিকে, তখন দেশি-বিদেশি চক্রান্তের ক্রীড়নক হিসেবে বিপথগামী কিছু সেনা কর্মকর্তা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে আক্রমণ চালালে প্রাণ হারান হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে এ কাপুরুষোচিত হামলাটি ঘটে। প্রথম তলার সিঁড়ির মাঝখানে পড়ে আছে চেক লুঙ্গি ও সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিথর দেহ। তাঁর তলপেট ও বুক ছিল বুলেটে ঝাঁঝরা। পাশেই পড়েছিল তাঁর ভাঙা চশমা ও অতিপ্রিয় তামাকের পাইপটি। একে একে ঘাতকরা হত্যা করে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা (বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী), শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র), শেখ জামাল (বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র), শেখ রাসেল (বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র), শেখ আবু নাসের (বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোটো ভাই), সুলতানা কামাল খুকু (শেখ কামালের স্ত্রী), পারভীন জামাল রোজী (শেখ জামালের স্ত্রী)। বঙ্গবন্ধু পরিবারের মোট ৮ জনকে হত্যা করা হয়। এই বাড়ির আঙিনায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর সিদ্দিকুর রহমানকে হত্যা করা হয়।

আগেই ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের মিন্টো রোডের বাসভবনে হামলা করে তাঁকে ও তাঁর মেয়ে বেবী, ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, বড়ো ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত, এক আত্মীয় আব্দুল নঈম খান রিন্টু ও তিন অতিথিসহ বাসার সবাইকে হত্যা করে। রাজনীতিতে সক্রিয় বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির ধানমন্ডির বাসায় আক্রমণ চালালে নিহত হন মণি ও তার স্ত্রী শামসুন্নেসা আরজু মণি।

সেদিন দেশে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। সে সময় স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে জার্মানিতে সন্তানসহ অবস্থান করছিলেন শেখ হাসিনা। শেখ রেহানাও ছিলেন বড়ো বোনের সঙ্গে।

স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কতিপয় রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তার উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে এবং স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ঘাতকচক্র এই বাড়িটি সিল করে রাখে এবং বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন। তিনি বাড়িটিতে প্রবেশ করতে চাইলে সামরিক সরকার তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। তখন তিনি বাড়ির সামনের রাস্তায় দোয়া-দরূদ পড়েন। অবশেষে ১৯৮১ সালের ১০ই জুন বাড়িটি তাঁর নিকট হস্তান্তর করা হয়। শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা ১৯৯৩ সালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের এ বাড়িটিকে জাদুঘরে রূপান্তরের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে ট্রাস্ট বাড়িটিকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত করে। ১৯৯৪ সালের ১৪ই আগস্ট জাদুঘরটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

শেখ কামালের কক্ষ

ছায়া সুনিবিড়, সবুজ গাছে ঘেরা সাদা রঙের তিনতলা মূল বাড়ি এবং এর পাশের সম্প্রসারিত আরেকটি ভবন নিয়েই জাদুঘর। বাড়িটির সামনে ধানমন্ডি লেক। বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের মূল বাড়ির প্রথম তলার শুরুতেই রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল এক ছবি। প্রথম তলায় রয়েছে ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্টে নিহত সবার ছবি এবং কিছু আসবাবপত্র। এই ঘরটি আগে ছিল ড্রইং রুম। এখানে বসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বৈঠক করতেন। এই ঘরের পাশের ঘরটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পড়ার ঘর। এখানে তিনি লেখালেখির কাজও করতেন। ১৯৭১ সালে এই ঘর থেকেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠিয়েছিলেন। এরপর দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় এখনো চোখে পড়বে সেই রাতের তাণ্ডবলীলার নিদর্শন, দেয়ালের গায়ে গুলির চিহ্ন। সেখানে শিল্পীর তুলিতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর গুলিবিদ্ধ অবস্থার একটি প্রতিকৃতিও রয়েছে।

দোতলায় বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষ। ১৫ই আগস্ট ভোরে বেগম মুজিব, জামাল, কামাল, রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ এখানে পড়েছিল। আর এ ঘরের সামনে করিডোর থেকে নিচে যাওয়ার জন্য যে সিঁড়ি সেখানেই ঘাতকদের গুলিতে মারা যান বঙ্গবন্ধু। এখনো গুলির স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়ে গেছে। সিঁড়িটি এখন দড়ি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে তাঁর বিছানার পাশেই ছোটো টেবিলে সাজানো আছে তাঁর হাতে থাকা পাইপটি। তামাকের কৌটা। এ কক্ষে অন্যান্য আসবাবের মধ্যে আরো আছে টেলিফোন সেট ও রেডিও। কিছু রক্তমাখা পোশাক। সামনের খাবার ঘরের পাশেই আছে শিশু রাসেলের ব্যবহার করা বাইসাইকেল। উলটো দিকে শেখ জামালের কক্ষে দেখা যায় তাঁর সামরিক পোশাক। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানার কক্ষও একই তলায়। বাড়ির তৃতীয় তলায় শেখ কামালের কক্ষ। এ কক্ষে তাঁর বিভিন্ন সংগীতযন্ত্র সাজিয়ে রাখা আছে।

এ ভবনের মোট নয়টি কক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আরো আছে বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ সুলতানা কামালের বৌ-ভাতের সবুজ বেনারসি শাড়ি, রোজী জামালের লাল ঢাকাই জামদানি, বিয়ের জুতা, ভাঙা কাচের চুড়ি, চুলের কাঁটা, শিশুপুত্র রাসেলের রক্তমাখা জামা, বঙ্গবন্ধুর রক্তমাখা সাদা পাঞ্জাবি, তোয়ালে, লুঙ্গি, ডায়েরি ইত্যাদি।

এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহার্য আসবাবের মধ্যে আরও আছে খাবার টেবিল, টেবিলের ওপর থালা, বাটি। আছে রেকসিনের সোফা। এই ঘরের দেয়ালেও রয়েছে গুলির চিহ্ন। এখানে পিয়ানো, সেতার ইত্যাদি আগের মতো করেই সাজানো আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাযজ্ঞ, লুটপাটের পর যা কিছু ছিল সব দিয়ে আগের মতো করেই সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে পুরো বাড়িকেই।

বাড়ির পেছনেই জাদুঘরের সম্প্রসারিত নতুন ভবন। এর নাম 'শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুন গ্যালারি'। বঙ্গবন্ধুর বাবা-মায়ের নামে রাখা হয়েছে নতুন ভবনের নাম। ২০১১ সালের ২০শে আগস্ট এ অংশটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়। ছয় তলা ভবনের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র রয়েছে। পঞ্চম তলায় পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। জাদুঘর ভবন থেকে বের হয়ে এসে রাস্তার উলটো দিকে লেকের পাশে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি।

জাদুঘরের ঠিকানা হলো ঢাকার ধানমন্ডির বাড়ি-১০, রোড-৩২ (পুরাতন), ১১ (নতুন)। এর সামনে রয়েছে ধানমন্ডি লেক। এখানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বুধবার। বুধবার ছাড়া যে-কোনো দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত ঘুরে দেখতে পারেন দর্শনার্থীরা। টিকিটের মূল্য মাত্র ৫ টাকা। তবে ৩ বছরের নিচের বাচ্চাদের জন্য কোনো টিকিট কাটতে হয় না। আর যাদের বয়স ১২ বছরের কম, তাদের জন্য রয়েছে শুক্রবারে বিনামূল্যে জাদুঘর ঘুরে দেখার সুযোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটি বাঙালির জাতিসত্তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তির ঠিকানা। এ বাড়ি থেকেই বাঙালি জাতি পেয়েছিল মুক্তির দিক নির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা। এই বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড ও লাল-সবুজের পতাকা। এ বাড়িতেই শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এখানেই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অহংকার। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের দুর্দান্ত সংগঠক, পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রামী, ৬ দফার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের কারিগর, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির মানসপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আছেন অবিনশ্বর হয়ে; চেতনার দীপ্ত প্রতীক হিসেবে। তাই শোকাচ্ছন্ন বাঙালি এদিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। বঙ্গবন্ধু আদর্শিক চেতনা আমাদেরকে দ্বিগুণ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। কোনো কোনো দর্শনার্থীর মতে, এ বাড়ি একটি ইতিহাস। বাড়িটির প্রধান সদস্য এ ইতিহাসের স্রষ্টা, আর তাই এটা কোনো বাড়ি নয়, ইতিহাসের তীর্থস্থান। তাই প্রতিবছর ১৫ই আগস্টে শোকার্ত মানুষের সব স্রোত যেন মিশে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। শোকের সাগরে দুলে ওঠে বাঙালির আত্মশক্তির প্রবল ঢেউ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকারও ব্যক্ত হয় এ জনস্রোতে। 'এক মুজিব লোকান্তরে– লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে' স্লোগানের বাণীর মতো আমাদের প্রত্যাশা– মুজিবের চেতনা বাঙালির অন্তরে সুদৃঢ় হোক এবং ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নিবন্ধ

কোরবানির ঈদ: মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র সহায়ক হতে শেখায়

খান চমন-ই-এলাহি

কোরবানির ঈদের প্রভাব ও করণীয় অনেক বেশি। এই ঈদ 'ঈদ-উল-আজহা' নামে জিলহজ মাসের ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১০ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। পবিত্র হজে যাওয়া প্রত্যেক হাজিকে অবশ্যই কোরবানি দিতে হয়। অন্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'সামর্থ্য' থাকার শর্তে কোরবানি দিতে হয়। অর্থাৎ সকল মুসলমানকে কোরবানি করতে হয় না। তবে কোরবানির হক ও তাৎপর্য গভীরভাবেই সকল মুসলমানদের কাছে পৌঁছে যায়– যেতে হয়।

কোরবানি কী? ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু উৎসর্গ বা বিসর্জন করাই হলো কোরবানি। একটু অন্যভাবে বলা যায়, ঈদুল আজহার দিন যে পশু জবেহ করা হয় তা-ই কোরবানি। আর ঈদ-উল-আজহা অর্থ আত্মত্যাগের আনন্দ। অর্থাৎ কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আনুগত্যকারী ব্যক্তির আনন্দ। পবিত্র কোরআনে কোরবানি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর এবং কোরবানি কর।' আল্লাহ তায়ালা নামাজের মতো কোরবানির গুরুত্বও তুলে ধরেছেন, যাতে আমরা এর তাৎপর্য অনুভব করি। তবে কোরবানির ইতিহাস চৌদ্দশ বছর বা পাঁচ হাজার বছরের নয়। মানব সৃষ্টির সাথে কোরবানির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হাবিল-কাবিলের সময়েই কোরবানির প্রথা শুরু হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেমন সৃষ্টি হতে থাকে, কোরবানির ধারণাও তেমনি পরিবর্তিত হতে থাকে। কোরবানির পশু জবেহ করা বা জবেহ করে পুড়িয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়াসহ নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল কোরবানিতে। তবে বর্তমানে আমরা যে কোরবানি অনুসরণ করি, তা হলো সেই কোরবানি যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পিতা-পুত্রের পরস্পরের সম্পর্ক ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা হিসেবে আমাদের কাছে এসেছে।

মুসলমানদের তাগিদ দিতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা সুরা আল ইমরানের ৯৫নং আয়াতে বলেছেন, 'বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন, এখন সবাই ইব্রাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারি। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

কোরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হয়। দেশ ও জাতি এ কোরবানির মাধ্যমে উপকৃত হয়। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় হয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। প্রবৃদ্ধি বাড়ে। কোরবানি সম্পর্কে তাই পবিত্র কোরানের সুরা হজের ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে ইহাদের (কোরবানির) পশুর মাংসও পৌঁছায় না, ইহার রক্তও না। তবে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া পৌঁছিয়ে থাকে।'

এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'হে লোক সকল, জেনে রাখ, প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কোরবানি করা আবশ্যক (মিশকাত)।' সামর্থ্যবানদের কোরবানি অবশ্যই করা উচিত। এতে একদিকে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়, অন্যদিকে গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটারও ব্যবস্থা করা হয়। নবিজি (সা.) কোরবানির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটও না আসে।'

কোরবানি এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে নবি (সা.) বিদায় হজ আদায়কালে একশ উট কোরবানি করেন। তন্মধ্যে তেষট্টিটি নিজ হাতে অবশিষ্টগুলো নবি (সা.)-এর আদেশক্রমে হযরত আলী (রা.) জবেহ করেন।

মিশকাত শরিফের এক হাদিসে এসেছে, 'কোরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর দরবারে কবুল করে নেওয়া হয়। তাই তোমরা অতি ঘনিষ্ঠ মনে কোরবানি কর।'

কোরবানি কার ওপর ওয়াজিব

যার নিকট ঈদুল আজহার দিনগুলোতে জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা বাহান্ন তোলা রুপা বা সমমূল্যের জিনিস আছে, তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব। সারা বছর এ পরিমাণ সম্পদ থাকার দরকার নেই। ঈদুল আজহার দিনগুলোতে থাকাই যথেষ্ট। তবে নাবালেগ, পাগল ও নাবালেগা ছেলেমেয়ের পক্ষে কোরবানি করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। আবার কেউ অন্যায় সুযোগ নিয়ে শরিয়া আইন লঙ্ঘন করে নাবালেগ ছেলেমেয়ে মালদার অর্থাৎ টাকা-পয়সাওয়ালা হলেও তার বা তাদের পক্ষে তাদের সম্পদ খরচ করে কোরবানি করা যাবে না। মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোরবানি করা যায়। কারো পক্ষে ওয়াজিব কোরবানি করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অন্যথায় কোরবানি হবে না। কোনো উদ্দেশ্যে কোরবানির মান্নত করলে অবশ্যই তা করতে হবে– করা ওয়াজিব।

কোরবানি কখন করতে হয়

কোরবানি জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত কোরবানি করা যায়।

কোন কোন পশু কোরবানি করতে হয়

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বা দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ। অন্য কোনো পশু দ্বারা কোরবানি করা যাবে না। তবে মনে রাখা ভালো যে, ছাগল, ভেড়া, দুম্বার বয়স একবছর, গরু-মহিষের

বয়স দুই বছর এবং উট পাঁচ বছর হওয়া আবশ্যক। আর অংশীদার ভাগের ক্ষেত্রে গরু, মহিষ ও উট ঊর্ধ্বে ৭ জন পর্যন্ত শরিক হতে পারে। তবে শরিকদের কেউ যদি গোশত বা মাংস খাওয়ার নিয়তে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত অন্য কোনো দুনিয়াবি সুযোগ-সুবিধার যেমন, বিয়ে, জন্মদিন, উৎসবের কারণে ভাগে কোরবানি দেয় তাহলে সকলের কোরবানি নষ্ট হবে। অর্থাৎ কোরবানি হবে না। সুদ, ঘুষ অবৈধ টাকায় কোরবানি করে লোক দেখানো সুবিধা নিলে কোরবানি হবে না।

পশুটি কেমন হবে

মোটাতাজা সুস্থ পশু দ্বারা কোরবানি করতে হবে।

কীরূপে জবেহ করতে হয়

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ করলে হালাল হয়। আর সেটি নিজে করতে পারলে ভালো। নিজে না পারলে অন্য কাউকে দিয়েও করানো যায়।

কোরবানির গোশত কী করতে হয়

কোরবানির গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাওয়া, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করা ও এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের দান করা মোস্তাহাব। তবে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর আগে কোরবানি করার জন্য অসিয়ত করে, তবে সেই কোরবানির গোশত নিজেদের খাওয়া চলবে না। সম্পূর্ণ গোশত বিলিবণ্টন করতে হবে। আরো মনে রাখা দরকার যে, কোরবানির গোশত মজুরি বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। এটি জায়েজ না। আর একটি সুসংবাদ হলো, ঈদুল আযহার দিন সকাল থেকে কিছু না খেয়ে কোরবানির মাংস দ্বারা প্রথমে খাওয়া মোস্তাহাব।

কোরবানির চামড়া কী করতে হয়

কোরবানির চামড়া বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা গরিব-মিসকিনকে দিতে হবে। সরাসরি মসজিদে বা অন্য কোনো সৎকাজে ব্যয় করা জায়েজ নয়।

ঈদের নামাজ ও কোরবানি প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর বাণীর আলোকে ঈদের দিনে যেভাবে তৈরি হতে হয় তাহলো–

◆ খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, মিসওয়াক করা ◆ সাধ্যমতো নতুন ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা ◆ ফজরের নামাজের পর ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা ◆ সুগন্ধি ব্যবহার করা ◆ সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া ◆ ঈদুল আযহার দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং কোরবানির পশুর গোশত দ্বারা খাওয়া আরম্ভ করা ◆ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া-আসা ◆ ঈদগাহে এক পথে যাওয়া ও অন্য পথে আসা ◆ ঈদগাহে নামাজ পড়া ◆ ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলা ◆ ঈদের নামাজের পর খুতবা দেওয়া সুন্নত, আর শোনা ওয়াজিব।

নামাজের পর কোরবানি

পশু কোরবানি নিজে করতে পারলে ভালো। আর না করতে পারলে অন্য লোক দিয়ে করাতে হবে। অবশ্যই দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যাতে সঠিক নিয়মে কোরবানি করা যায়। অনেক সময় দক্ষ লোকের অভাবে কোরবানির পশু হাঁটা দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। চামড়ার ক্ষতি হয়, ইত্যাদি।

◆ আল্লাহর নাম নিয়ে কোরবানি শুরু করতে হয়। কোরবানির কাজে ব্যবহৃত ছুরি মাথাওয়ালা ও ধারালো হওয়া ভালো। ◆ সঠিক নিয়মে পশু শোয়াতে হয়। টানা-হেঁচড়া যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ঈদের দিন সকালে পশুকে শক্ত খাবার দিতে হয় না। পানি বা ভাতের মাড় ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। চামড়া যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য সল্ট ট্রিটমেন্ট বা লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ড্রাই ট্রিটমেন্ট ও ফ্রিজিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোরবানির নানাবিধ দায়িত্ব

কোরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে রক্ত

বা মাংস বা চামড়ার কোনো কিছুই পৌঁছে না। শুধু পৌঁছে তাকওয়া, পৌঁছে বিশ্বাস, পৌঁছে উদ্দেশ্য, পৌঁছে ত্যাগের মহত্ত্ব।

তাই কোরবানির সময় আমাদের মনে রাখা দরকার আমার কোরবানির কারণে অন্য কারো হক যাতে নষ্ট না হয়। আমার কোরবানিতে অন্য কোনো নাগরিক সে মুসলমান কি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কারো হক নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। দেশের সকল মানুষের, পরিবেশ ও সুস্থতার দিকে নজর দিতে হবে। সে কারণে পশুর উচ্ছিষ্ট বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। সম্ভব হলে অনেকে মিলে একস্থানে কোরবানি দিতে হবে, যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সহজ হয়। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সহজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি করতে পারে। অথবা নিজেরা মিলে যৌথভাবে পরিবেশবান্ধব কাজটি করা যায়। মনে রাখতে হবে, কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য খোলা স্থানে রাখা যাবে না। এগুলো মাটিচাপা দিয়ে পুঁতে রাখতে হবে। অন্তত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল-হাবিলের সময়ে কোরবানির শুরু। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরবানি ছিল। হযরত নূহ (আ.) কোরবানির গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) কোরবানিকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় নবি ইব্রাহিম যেমন জয়লাভ করেছেন, পুত্র ইসমাইল (আ.) আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় পিতার কাছেও জয়লাভ করেছেন। জয়লাভ করেছে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ও আনুগত্য। আল্লাহর রাসুল (সা.) বিদায় হজে একশটি পশুর মধ্যে ৬৩টি নিজে কোরবানি করে কোরবানির গুরুত্বকে মুসলমানের কাছে আবশ্যিকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে তা কবুল হয়। ভুললে চলবে না, পৃথিবীর সব যুগে পশুর মাংস মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে। মূলত এটি হলো একটি শিক্ষা, যা আত্মত্যাগ, মহত্তম উপায়ে তুলে ধরা।

লেখক: কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আইনজীবী

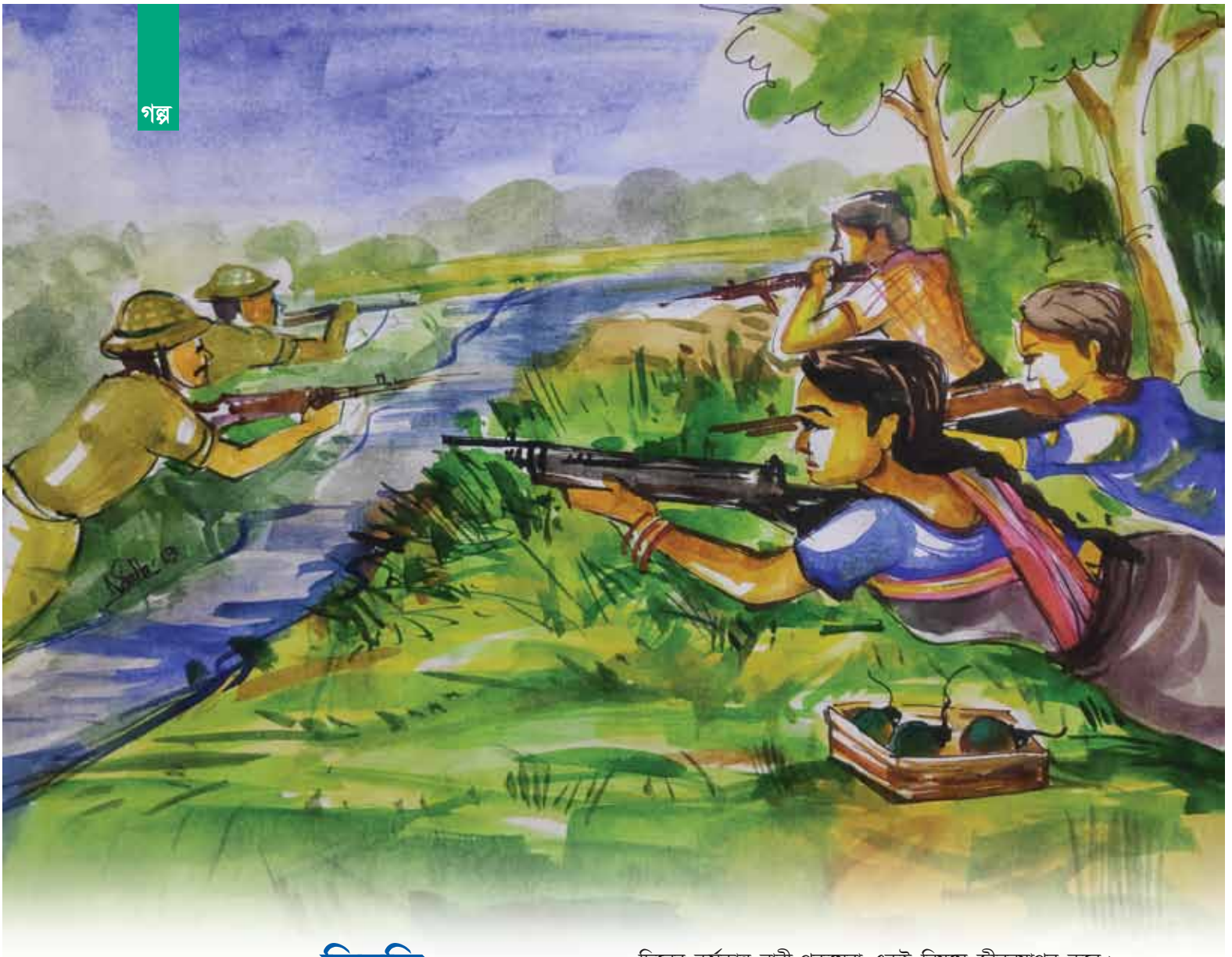

ফিনকি

জয়া সূত্রধর

পুরোনো গেরস্ত বাড়ি। গ্রামের উত্তর পাশের খাল আড়াআড়িভাবে পার হয়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণে গিয়ে হাতের বাম পাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত রেখে বিশাল পুকুরের পার ঘেঁষে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঠেকা দেওয়া মাটির সিঁড়িতে দশটা ধাপ ওপরে উঠলেই ঝড়ু মাতব্বরের বাড়ি। ধন, মান, জন আর যশ বল থাকার কারণেই হয়ত লোকজন একে বড়ো বাড়ি বলে থাকে। বাড়ির পূর্বদিকে বিশাল বাংলাঘর। এ ঘরে নিয়মিত পাঁচ ছয়জন রাখাল ছাড়াও বিভিন্ন শস্যের মৌসুমে দূরদূরান্ত থেকে আসা শ্রমিকেরা দিনভর মাঠে কাজ করে রাতে ঘুমানোর সুযোগ পেয়ে থাকে। বাড়ির দক্ষিণের শেষ মাথায় গরু রাখার বড়ো একটি গোয়াল ঘর। উলটোদিকে ঝড়ু মাতব্বরের একসারি করা তিনটে টিনের ঘর। মাঝে মস্ত বড়ো উঠান। একটু আগেই উঠানে নাড়া পোড়ানো হয়েছে। এখনো বাড়ি সুদ্ধ নাড়া পোড়ানো গন্ধ। সন্ধ্যাকালে সবগুলো গরু চক্রাকারে খুঁটিতে বেঁধে নাড়ার ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়িয়ে তারপর মশারি টানিয়ে গরুগুলোকে গোয়ালে তোলা হয়। গরু গোয়ালে তোলার পর সমস্ত বাড়ি তলিয়ে যায় নিঝুম ঘুমের গহ্বরে। শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই এ বাড়ির সারা দিনের কর্মক্লান্ত নারী-পুরুষেরা একই নিয়মে জীবনযাপন করে। শুধু মাতব্বর বাইরের বৈঠক ঘরে গ্রামের সালিশি কাজ করেন। এখন অবশ্য সালিশি কাজ বন্ধ। দেশে পাক হানাদারবাহিনীর অত্যাচারে গ্রামের মানুষগুলো নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ-বিভেদ ভুলে গেছে। এখন অস্তিত্ব রক্ষার টানে সমস্ত গ্রামে সন্ধ্যা নামে ভয় আর ত্রাসে। এমনি এক অমাবস্যার রাতে নিস্তব্ধ অন্ধকারের জালে টর্চের আলো ফেলে আগুন-মুখা নাড়া পার হয়ে বেশ কতগুলো বুটের মচমচ শব্দ ভেতর বাড়ি গিয়ে থামল। দরজার পিতলের রিংয়ে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। ঘরের মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি জেগে রয়েছে ঠিক বোঝার উপায় নেই। তবে দরজা খুলতে সময় লাগল না বেশি। তেল শেষ হয়ে আসা বা সলতে পুড়ে যাওয়া কুপির টিমটিমে আলো হাতে দরজা খুলে দিল আনুমানিক ১৬/১৭ বছরের এক যুবতি। দরজা খোলার শব্দে দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ঝড়ু মাতব্বর। কিন্তু যুবতি মেয়েটি বৃদ্ধকে আগলে নেওয়ার ভঙ্গিতে পেছন দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাপজান, আফনে সরুইন যে'!

বৃদ্ধ বাবার মুখে কথা ফোটে না। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে যেন শুধু পরবর্তী ঘটনার সাক্ষিগোপাল হতে।

কুপির নিভুনিভু আলোয় মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তার চোখ থেকে এক ধরনের অদ্ভুত আগুন ঠিকরে পড়ছে তা আগন্তুকের দল ঠিকই বুঝতে পারে।

বেশি বুঝে কাজ নেই। এখানে আসার সপ্তাহ খানেক আগে উড়ো চিঠি উঠানে ফেলে রেখে সতর্ক করা হয়েছিল ঝড়ু মাতব্বরকে। ক্ষেত কামলা হিসেবে ঢুকে এই বাড়িতে প্রায়ই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা খাওয়া দাওয়া করে যায়– এ মর্মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাতব্বরকে উদ্দেশ করা চিঠিতে লিখা হয়–

মাতব্বর,

চালাকি করিও না। তোমারে আমরা গেরামের মানুষ মান্য করি। পাকিস্তানের মাটিতে থেকে পাকিস্তানের সাথে বেইমানি করিও না। বেইমানির ফল জানোতো? মস্তক দিয়ে তার দাম দিতে হইবে।

ইতি,

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

এই চিঠি নিয়ে সমস্ত গ্রামে তোলপাড় হয়ে গেল অথচ এরপরেও মুক্তির লোক এই বাড়িতে? আফসার মোল্লা লম্বা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে দরজা আগলানো মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায়। ইচ্ছে– গায়ে গা লাগার ভয়ে মেয়েটা দরজা ছেড়ে দেবে। এই একটা সময়! এখন আর কারুর ঘরে যেতে অনুমতি লাগে না, অন্দরমহলের মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিলেও আপত্তি করার কিছুই থাকে না। যুদ্ধের কী যে ভয়ানক শক্তি তা শতভাগ বুঝে গেছে আফসার মোল্লা আর তার চক্রের লোকেরা। সারাদেশে তারাই এখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ডান হাত। কোন বাড়ির কয়জন ছেলে মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, কার বাড়িতে রেডিও বাজিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, বিপ্লবী গান, তাজা খবর শোনা হয়, কোন পাড়ায় সাঁকো উপড়ে পাকিস্তানিদের আসা-যাওয়া প্রতিহত করার ষড়যন্ত্র করা হয়– তার সব খবরাখবর তারাই প্রতিনিয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকবাহিনীকে দিয়ে আসছে। নইলে কী আর এখানে ওরা এত সুবিধা করতে পারত? অবশ্য আফসার মোল্লা ও তাদের মতো জাতিপ্রেমিকরা একে সহযোগিতা মনে করার পরিবর্তে পবিত্র দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করে। অথচ বিপথগামী এই জাতি এক পতাকার তলে থেকেও তাদেরকে রাজাকার বলে গালি দেয়! দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো আর আজ কি-না কিছু লোকের চাওয়ায় পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে যাবে? এ কখনো হতে দিবে না তারা। বিভ্রান্ত মানুষদের সঠিক পথে আনতে আজ প্রয়োজনেই হিংস্র হতে হচ্ছে। যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতেই হবে।

কোন শয়তানের ভরে দেশ আজ টালমাটাল সে ওপরওয়ালা ছাড়া কেউ জানে না। শয়তান শায়েস্তা করতে শয়তান ভর করা মানুষকে প্রহার করতে হয়। এতে লাজভয় থাকতে নেই। আফসার মোল্লাও তাই মেয়েটির অগ্নিদৃষ্টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ধমকে উঠল,

– তুমগোর ঘরে মুক্তির পোলা আছে। অগোরে বাইর কইরা দ্যাও, সাহেবরা তোমগোরে কিচ্ছুই কইত না।

আফসার মোল্লার কথা গলানো সুর হয়ত পছন্দ হলো না রজ্জু মুন্সির। সাদা চামড়ার মিলিটারির হাতে ধরা পিস্তলের বাট সামনে এগিয়ে ধরে রজ্জু মুন্সি বাঁকা চোখের ইশারা দিয়ে হাসির ধমকে বলল,

– এইডারে ডরাও না? এই মানুষগুলারে ডরাও না? এইডা দিয়া অহনই তুমগোরে ওইপারে পাডাইয়্যা দিব, যাতে তোমরা গুনাহ করার সুযোগ না পাও। তয় মাইয়্যা হুন, এই দ্যাশে সহি মুসলমান হইয়া থাকতে পারলা না। কাফেরগোর লগে জোট বান্ধিছ। আবার ওই বড়ো বড়ো সাহেবগোর লগে তেজ দেখাইতেছ?

এসব বলার ফাঁকেই আফসার মোল্লা মেয়েটির ডানহাতের কনুই উঁচুতে ধরে বগলের নিচ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। দরজার পেছনের ডান কোণে একটি খাট। কাঁথা গায়ে কেউ শুয়ে আছে সেখানে। আফসার মোল্লা কাঁথার কোণা ধরে হ্যাঁচকা টান মারার আগেই কোথায় যেন বাধা পেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেক তরুণী কাঁথার ভেতর থেকে বেরিয়ে দুম করে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীষণ বাজখাঁই গলায় বলল,

– চাচা, আফনের ঘরে কি বেটি নাই? স্বামী আমার ভুল কইরা মুক্তিগোর হাতের শরবত খাইয়া মরে মরে অবস্থা। কবিরাজে বিষ

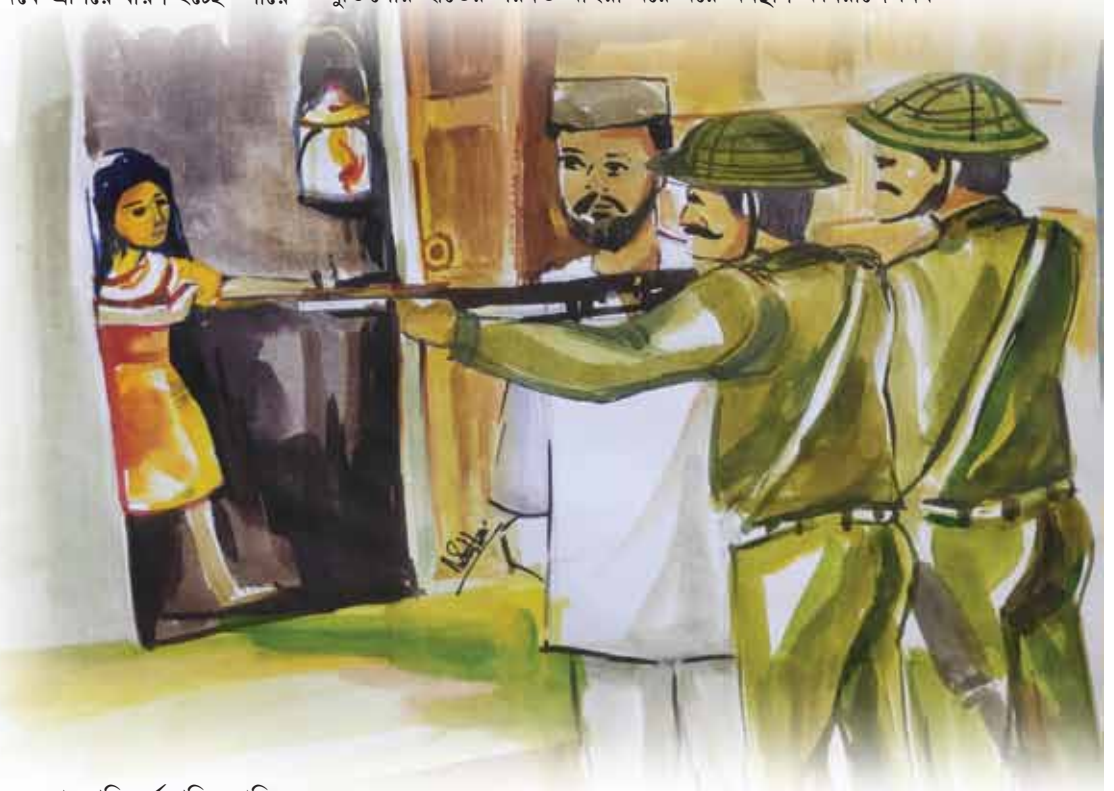

কাডাইয়া ঘুমের ওষুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাইখ্যা গেছে। আর কইছে য্যান ওর বুকের নিয়াশ ঠিক আছে কি-না বারো ঘণ্টা দেখি। আফনে জানা নাই শুনা নাই, মিলিটারি লইয়া মরা স্বামীরে মুক্তি বানাইয়া মারতাম আইছুইন?

ঝড়ু মাতব্বর অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কেবলি সব শুনে যাচ্ছিল। কাঁধে আফসার মোল্লা একটি হাতের স্পর্শ টের পেয়ে সমস্ত শরীর ঘৃণায় নড়ে উঠল যেন। আফসার মোল্লা কিছু বলে ওঠার আগেই সে বলতে শুরু করল,

– ভাই, দ্যাশের যে অবস্থা! মুক্তিরা কহন, কুণ্ঠে কী আকাম কইরা বসে সেই ভয়ে বেডি দুইটারে কয়দিন আগেই বিয়া দিয়া দিছি।

মিলিটারিরা একটু সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন জরুরি কথা সেরে নিচ্ছিল।

রজ্জু মুন্সি দুইহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি শূন্যে নাচিয়ে অবিশ্বাসের সুরে চিৎকার করে উঠল,

– বেডি বিয়া হইছে বড়ো বাড়ির। কাক পক্ষীও জানল না?

– হইব, হইব। জামাইরে এট্টু দোয়া দিয়া যান হুজুর। আগে সাইরা উঠুক।

রজ্জু মুন্সি খাটের কাছে গিয়ে রুগ্নের মাথার দিক অনুমান করে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সুরা পড়ে ফুঁ দিয়ে দিল। কিন্তু বুকের মাঝে খচখচ করতে থাকা সন্দেহ দূর না হওয়ায় সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে মুক্তিসেনা আর যুদ্ধের তিলসমান নমুনা খুঁজে বেড়াল। কোথাও কিছুই পাওয়া গেল না।

সূর্যের তাপে বরফের পিণ্ড থেকে কিছুটা বরফ গলে গেলেও রাতের অন্ধকারে আবার যেমন তা কঠিন হয়ে যায় তেমনি প্রমাণের অভাবে পরিকল্পিত শাস্তি রহিত করলেও বড়ো বাড়ির প্রতি পাকিস্তানি আর দেশীয় দোসরদের অবিশ্বাস ও প্রতিহিংসার আগুনের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কার আগাম সংকেত হিসেবে সামনে পড়ে যাওয়া এক রাখাল ছেলেকে পিটিয়ে জখম করে বাংলাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বাংলাঘরের আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত বাড়ি আলোকিত হয়ে উঠল। ঘরে যে কয়জন রাখাল ছিল কারুরই যেন আগুনের বিভীষিকাময় রূপের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সকলেই মাতব্বরের ভেতরের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করে যাচ্ছে এক অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় দৃশ্য।

মাতব্বরের দুই মেয়ে। আয়না আর ময়না। পিঠাপিঠি বোন। তাই গায়েগতরে দুজনকে প্রায় একই সমান দেখায়। আয়না, ময়না দুজনে এসে মাতব্বরের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। মাতব্বর কঠিন চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাতব্বরের ঐ দৃষ্টিকে ভয় পায় না এমন কেউ নেই এ বাড়িতে। আয়নার সাহস একটু বেশি। সে কান্না থামিয়ে অপরাধীর সুরে বলতে শুরু করল,

– আব্বা, আমগোরে আফনে মাফ করুইন যে! আমি গুনাহ করছি। ওই বেগানা ছেড়ার লগে আমি শুইয়া পড়ছিলাম তহন। আব্বা, না হইলে যে ওনারে ধইরা মাইরা ফালাইত মিলিটারিরা। আব্বা...।

মুখের কথা মুখেই থেকে যায় আয়নার। মাতব্বরকে মেয়েদের কান্না থামানো বা কথা শোনা কোনোটাতেই আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না।

ঘরে শুয়ে থাকা যুবকটিকে মাতব্বর ঘরের বারান্দায় একটি চেয়ারে বসিয়েছেন। যুবকটির চোখে মুখে এতটুকু ভয়ের লেশ নেই। তবে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। মাথা উঁচু, বুক টান করে সে চেয়ারে বসে আছে। মাতব্বর ছোটো ধারালো একটি কাচি হাতে নিলেন। সেটা দিয়ে নিজের লম্বা আধাপাকা দাঁড়ির প্রায় অর্ধেক করে কেটে নিলেন। কারোর সাহায্য নিলেন না। সবাই হতবাক। কী হবে এসব দিয়ে! মাতব্বর এইবার উঠানে জিকা গাছ থেকে কতকটা আঠা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে এলেন। পানিতে ভিজিয়ে তা নরম করে নিলেন। এরপর যুবকের গালে, থুতনিতে আঠা লাগিয়ে নিজের ছাঁটা দাঁড়িগুলো বসিয়ে দিলেন। মাথায়, শরীরে গেরুয়া কাপড়ে পেঁচিয়ে হাতে তুলে দিলেন একটি দোতারা। যুবককে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'পুকুরপাড় ঘেঁষে ক্ষেতের আইল ধরে সোজা পশ্চিমে যাইও। খাল পার হইয়া তুমি তোমার সহযোদ্ধাদের দেখা পাবে। এখন আর কোনো বিপদ নাই তোমার।'

যুবকটি মাতব্বরের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল।

আয়না যে কাজ করেছে তা কোনো সাধারণ কাজ নয়। এ কাজ কেবল অকুতোভয় বীরেরই সাজে। প্রাণ বাঁচানোর এমন দায় শুধু দেশপ্রেমিকেরই থাকে। বিদ্যার জোর খুব বেশি না থাকলেও বুদ্ধির জোরে পোশাকি সৈন্যদের চাইতে সে কম কিছু নয়। পুড়ে যাওয়া ঘরের ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে আসা চোখ দুহাতে কচলাতে কচলাতে এসব ভাবতে থাকে গরুর রাখাল হিসেবে পাঁচ বছর ধরে এ বাড়িতে বসবাস করা তুহিন মণ্ডল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আয়না, ময়নার নিরাপত্তার কথা তুহিনের মাথায় চেপে বসে। ওরা দুইবোন আজ যা করেছে তা জানাজানি হবেই। তখন কে বাঁচাবে এদের? আশঙ্কায়, আতঙ্কে বুক কাঁপে তুহিনের। এগিয়ে যায় মাতব্বরের দিকে।

তারপর শুরু হয়েছিল নতুন গল্প। বিস্ময়ভরা চার চোখের মিলনে নতুন জীবনের পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সাহসী বীর নারীকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে স্ত্রী হিসেবে সুদূর ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে আসে নিজ বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার চরবেউথা গ্রামে।

পাকিস্তানি হায়েনাদের থেকে বাঁচাতে অন্যসব মানুষের মতো ঝড়ু মাতব্বর ময়নাকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতীয় আশ্রয় শিবিরে। কিন্তু ময়নাকে ধরে রাখতে পারেননি তিনি। ময়না পালিয়ে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বাংলার শত শত দামাল ছেলেদের সঙ্গে সে নির্ভয়ে এগিয়ে চলে সমান তালে। শিবিরের রেনু মাসি তাকে সাহস জোগায়। রেনু মাসি মুক্তিশিবিরে রান্নার কাজ করে। প্রতিদিন নতুন করে যুক্ত হয় নবীন ছেলেরা প্রশিক্ষণ শিবিরে। রেনু মাসি ময়নাকে উদ্দেশ করে বলে,

– তুই ভালো করে যুদ্ধ শিখে যা মা। তোর দেশকে স্বাধীন কর। তোর কোনো ভয় নেই। আমাদের মা ইন্দিরা গান্ধি তোদের সাথেই আছে। তুই আমার দেশের মায়ের মতো সাহসী হ। অন্যায়ের কখনো জয় হয় না। মনে রাখিস।

ময়না প্রশিক্ষণ শেষ করে যুদ্ধের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নিজেকে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দলে সে প্রত্যাখ্যাত হয়।

নারীযোদ্ধা থাকায় তাদের মিশন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এখন এক মুহূর্তের ভুলও শুধরে নেবার কোনো অবকাশ নেই। একেকজন যোদ্ধা এক একেকটি বারুদ হয়ে ফেটে পড়ছে রণে বনে জলে জঙ্গলে। ময়না নিজেকে নারী ভাবে না। একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সে। দেশের জন্য জীবন দেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত ময়না হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে ছেলের ছদ্মবেশ ধরে ভারত সীমান্ত এলাকা রাজীবপুরে ঝোঁপঝাড়ের অন্তরালে থেকে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ধরা পড়ে গেল সে। সকলেই নারী মুক্তিযোদ্ধাকে বুঝিয়ে বাড়ি চলে যেতে পরামর্শ দিল।

ময়না এ দুঃখ সইতে পারল না। দেশের মুক্তির জন্য কিছু করার সুযোগ না পেয়ে নিজেই কোথায় হারিয়ে গেল! কোনোদিন আর ময়নাকে স্বাধীন দেশের মাটিতে দেখা যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের বীরকন্যা যাদের কথা দেশবাসী জানে না তাদের কথা প্রতিনিয়ত একাই বলে যায় তুহিন মণ্ডল। বয়সের ভারটাকে লাঠির ভরে এলিয়ে দিয়ে বলে যান প্রয়াত প্রিয়তমা স্ত্রী আয়না, বীরযোদ্ধা ময়না– যাদের স্মৃতি আজো তার হৃদয়ে রক্তের ফিনকি হয়ে ঝড়ে। তিনি ঘুরে ঘুরে আসেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা দিবসে, বিজয় দিবসে। ইচ্ছে হলেই বসেন পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। শোনান মুক্তিযুদ্ধের নানা কাহিনি। ভবিষ্যৎ জাতির প্রতি তার আহ্বান, তোমরা আমাদের দেশের মা-বোনদের ইজ্জত করবে। তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে এদেশের বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাঙালি নারীরা সাহসী। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের কাছে আমাদের ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। এদেশের মা-বোনেরা সম্মান পেলে তবেই স্বাধীনতা তার মান পাবে।

ক্ষুদে শিক্ষার্থী থেকে বড়ো শিক্ষার্থী সবাই প্রতিবার মন্ত্রমুগ্ধের মতো মন দিয়ে শুনতে থাকে তুহিন মণ্ডলের কথা। তার কথা জাদুর মতো মোহাবিষ্ট করে রাখে সবাইকে। তার কারণ কেউ বোঝে না। শুধু তুহিন মণ্ডল অনুভব করে, ফিনকি দিয়ে দেশপ্রেম আজ তার হৃদয় থেকে হাজার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আনন্দে, গর্বে বারবার গামছায় চোখ মোছেন তিনি।

আধুনিক কৃষির রূপকার প্রজাবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলী হাসান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক জীবনে একজন প্রসিদ্ধ লেখক, প্রজাবান্ধব জমিদার এবং শুধুই সমাজ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলা অঞ্চলের আধুনিক কৃষির একজন রূপকারও। গ্রামবাংলার দুস্থ ও খেটে খাওয়া দুঃখী মানুষের মধ্য থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর রচিত সাহিত্যের বিখ্যাত ও কালজয়ী চরিত্র উপেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, জমিদারি প্রথা মানেই নিরীহ কৃষকের ওপর নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই না। তখনকার কৃষকরা ছিল জমিদার শ্রেণি দ্বারা সীমাহীন নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, নিরন্ন, অত্যাচারিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। প্রথমে তিনি এসব লোক মুখে জেনেছেন কিন্তু পরে তা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে নিষ্পেষিত কৃষক শ্রেণির সাথে মিশে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন, মনেপ্রাণে তাদের কষ্ট উপলব্ধি করেছেন। ১৫ বছর বয়সেই প্রথম শিলাইদহে নিবিড়ভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের গ্রামবাংলার সাথে সম্পৃক্ততা। তারও আগে আমরা জানতে পারি ১৪ বছর বয়সে লেখা কবির অভিলাষ কবিতায় দরিদ্র কৃষকের নিদারুণ দুঃখকষ্টের বাস্তব চিত্রপট উঠে এসেছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি অত্যন্ত ছোটো বয়স থেকেই কৃষক ও হত-দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনযাপন ও মর্মযাতনা সম্পর্কে জানতেন। সেই বালক বয়সে 'অভিলাষ' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, রৌদ্রের প্রখর তাপে ঘর্মসিক্ত দরিদ্র কৃষকরা কীভাবে ফসল ফলানোর কাজে সীমাহীন কষ্ট করে। কৃষক ও সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের নিদারুণ কষ্টভোগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন বলেই পরবর্তী জীবনে তিনি একজন প্রজাদরদি জমিদার হয়েছিলেন। একজন পরিণত মানুষ হিসেবে শিলাইদহে জমিদারির দায়িত্ব পেয়ে তিনি চেয়েছিলেন পল্লি উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষকে মানব সম্পদে রূপায়ণ করতে। সমবায় প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। কবি বিশ্বাস করতেন, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মধ্যেই সারা দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। তিনি মনে করতেন, কৃষি বলতে শুধু কৃষিপণ্যের ফলন বৃদ্ধিই নয়, কৃষিপণ্যের সুষম বণ্টন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের হাতে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, যাতে কৃষক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এজন্য আরো একটি বিষয় তিনি উপলব্ধি করতেন সেটা হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন করা, তিনি দেখেছেন মধ্যস্বত্বভোগীরা অনেক সময়ই কৃষকের অর্জিত ফসল ঘরে তোলার আগেই তার লভ্যাংশের অনেকখানি নিয়ে যায়। এজন্য কৃষকদের সম্মিলিতভাবে সমবায়ের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন ঘটাতে চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ সংগঠিত হলে সার্বিক উন্নয়ন সহজ হয়। তিনি দেখলেন, শত শত বছর ধরে নিষ্পেষিত এই কৃষককুলকে মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হলে তাদের মধ্যে স্বল্প ও সহনীয় সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে। এ ভাবনা থেকেই তিনি স্বল্প সুদে কৃষকের মাঝে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ সালে প্রথমে শিলাইদহে এবং পরে ১৯০৫ সালে পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করলেন। এ ধরনের ব্যাংক তৈরি করতে রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর নিকটজন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। পরে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য প্রাপ্ত নোবেল প্রাইজের যে বিরাট অঙ্কের টাকা পেলেন, সেখান থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দান করেছিলেন পতিসর কৃষি ব্যাংকের তহবিলে। কৃষি ব্যাংককে কেন্দ্র করে শিলাইদহ ও পতিসরে তিনি গড়ে তুললেন পল্লি সমাজ সংগঠন এবং তৈরি করলেন সমবায়ভিত্তিক যৌথ কৃষি খামার। এ সময় তিনি উপলব্ধি করলেন কৃষকদের শুধু ঋণ দিলেই হবে না এবং সমবায়ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করলেই হবে না অল্প সময়ে কৃষিকর্মকে অধিক বিস্তার করতে চাইলে অবশ্যই তারজন্য আধুনিক কৃষি উপকরণের প্রয়োজন হবে। এ সময় তিনি কলকাতা থেকে ৭টি কলের লাঙল বা ট্রাক্টর আমদানি করলেন। যুবক কৃষকদের জন্য আধুনিক কৃষিকর্ম, ফসল উত্তোলন, ফসল সংরক্ষণ এবং মৎস্যচাষসহ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন শিলাইদহ ও পতিসরে। কৃষককে সংগঠিত করে গড়ে তুললেন শস্য ও বীজ সংরক্ষণাগার। এ কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, কৃষির উন্নয়নে উল্লিখিত ইতিবাচক কর্মগুলো করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই– পতিসরের কৃষকদের জন্য আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আধুনিক জাতের ভুট্টার বীজ, মাদ্রাজ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বীজসহ অন্যান্য বীজ। এ সময় তিনি উপলব্ধি করলেন উন্নত বীজ, আধুনিক উপকরণ ও বিশাল কর্মীবাহিনী হলেই কেবল হবে না– কৃষকদের আধুনিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হলে কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা আছে এমন লোকের দরকার রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেয়ের জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বন্ধুর ছেলে সন্তোষ মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। স্মরণযোগ্য যে, তারা যথা সময়ে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে ফিরে পতিসরে এসে ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে কৃষকদের যথাযথ সেবা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৃষিঋণ প্রবর্তনের ফলে কৃষকদের কৃষিকর্মের অভাবনীয় সাফল্য দেখা দিয়েছিল। এছাড়া, জমিতে জৈব সার ব্যবহার, অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করা, সেচের মাধ্যমে জমিকে উর্বর করে তোলা, জমির আইলে বৃক্ষরোপণ করা ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত পদক্ষেপগুলো সেসময়ের কৃষি ব্যবস্থাকে তুলনামূলক আধুনিক করে তুলেছিল। একজন জমিদার হয়ে কৃষকের দুঃখকষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে সার্বিক কৃষিকাজের প্রতি মনোনিবেশ করে কৃষির উন্নয়ন করার এ রকমের দৃষ্টান্ত তখন সারা পৃথিবীতে আর কেউ-ই দেখাতে পারবে না। একজন বড়ো মাপের লেখক যে একজন বড়ো মাপের কৃষক দরদি মানুষও হতে পারে এটা সত্যি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর একটিও উদাহরণ নেই কোথাও। প্রজাদরদি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন যে– 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এ কারণেই জমিদারির জমি আকড়ে থাকতে আমার প্রবৃদ্ধি নেই। এ জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। জমিদারি ব্যবসায় আমার লজ্জাবোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলায় গতি ছেড়ে নিচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে 'পরজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি'।

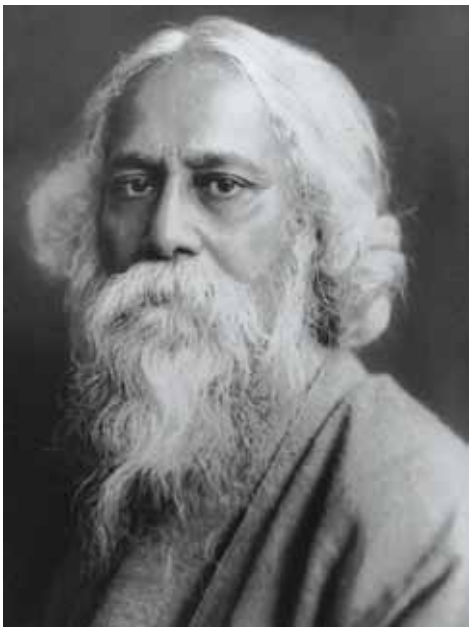

কৃষির উন্নতির প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশের চাষের জমির ওপর সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়েছে। আজ শুধু একলা চাষির চাষ করিবার দিন নাই। তাহাদের সাথে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সাথে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।' এই যাঁর জীবনোপলব্ধি, তাঁর মতো মানুষ কি সত্যিকারভাবেই কৃষক দরদি ও প্রজাবৎসল না হয়ে পারে?

লেখক: প্রাবন্ধিক

নজরুলের দেশাত্মবোধক জাগরণী গান

মো. আলী হোসেন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গানের সংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যও বহু বিচিত্রতায় বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। নজরুলের শিল্প-সাহিত্যের সৃজনশীল সক্রিয় জীবন তাঁর নিষ্ক্রিয় জীবনের তুলনায় নেহাতই কম। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যাপিত জীবনে সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় সদম্ভ পদচারণার পাশাপাশি নজরুল এত বিপুল সংখ্যক গান কী করে রচনা করলেন সেটা বিস্ময়কর, যা এক অসাধারণ শিল্পবৈচিত্র্যে সমুন্নতিপ্রাপ্ত। নজরুল মূলত গানেরই মানুষ, তাই মানুষের জন্য তাঁর রচিত গানগুলোই হয়েছে তাঁর নিজস্ব পরিচয়ের মূল নিয়ামক। তিনি প্রসঙ্গ পেলেই বলে উঠতেন– 'সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি জানি না, তবে

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর জাতীয় কবিকে স্বাগত জানান বঙ্গবন্ধু

সংগীতে যা দিয়েছি– তা আজ মূল্যায়িত না হলেও একদিন এর মূল্যায়ন ঠিকই হবে'। নজরুলের বহু বিচিত্র সংগীতধারার মধ্যে দেশাত্মবোধক জাগরণীমূলক গান এক অনন্য উচ্চতায় সমাসীন এবং বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীতধারায় তাঁর এই অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অমরত্বলাভ করেছেন। সমকালীন ইংরেজ শাসকদের দুঃশাসন ও নানা অনাচারের বিরুদ্ধে রচিত তাঁর দেশাত্মবোধক জাগরণীমূলক গানগুলো সে সময়ের প্রেক্ষাপটে যেমন বিপুল বৈচিত্র্য ও প্রাণস্পর্শী গভীরতায় পরম আদরে সেকালে গ্রহণীয় হয়েছে, পরবর্তীকালেও তা সংগীতের রস পিপাসু বাংলা ভাষাভাষী সকল শ্রেণির মানুষ এবং দেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতাদের সংগীত রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। বিষয়, প্রেক্ষাপট, ভাষা, ভাব, সুর ও ছন্দে নজরুল তাঁর দেশাত্মবোধক গানের ডালাকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন এবং এমন উচ্চতায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন যে, তা শুধু তাঁর সমকালীনতার প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার চাহিদাকেই পূরণ করতে সক্ষম হননি– চিরকালীন মানবের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবকেও স্থায়ীরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'নজরুলগীতি অখণ্ড' এবং অন্যান্য সংগীতের গ্রন্থগুলোতে নজরুলের মোট ১১৫টি দেশাত্মবোধক গানের সন্ধান আমরা পাই। প্রকৃত সংখ্যা হয়ত আরো বেশি হবে কিন্তু নজরুলের অন্যান্য গানের মতোই দেশাত্মবোধক গানগুলোও সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার দরুন কালের আবর্তনে হারিয়ে গেছে, এই আশঙ্কা মোটেও অমূলক নয়। এছাড়া নজরুল ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ হয়ে যাবার পরে সে সময়ে প্রকাশিত তাঁর গানের সংকলনসমূহে অনেক গানেরই কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। তারপরও যতগুলো দেশাত্মবোধক গান সংরক্ষিত আছে তা বাঙালির জন্য আত্মগর্বের ও পরম অনুপ্রেরণার উৎস নিশ্চয়ই। নজরুলের সংগীত ভাণ্ডারের যে বৈচিত্র্যতা উল্লিখিত হলো, আশ্চর্যের ব্যাপার যে বৈচিত্র্যশীল এসব সংগীত, অঙ্গেরও রয়েছে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গসমূহ। যেমন দেশাত্মবোধক গানকে কমপক্ষে ৭টি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন–

১. দেশবন্দনামূলক গান, ২. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, ৩. শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, ৪. নারী জাগরণমূলক গান, ৫. মুসলিম জাগরণমূলক গান, ৬. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গীতি, ৭. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশাত্মবোধক গানের যতগুলো প্রশাখার কথা উল্লিখিত হলো তার মধ্যে নজরুল প্রতিভার সর্বোচ্চ বিস্ফোরণ ঘটেছে তাঁর রচিত সংগ্রামমূলক গানে। তবে সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণমূলক গান ও দেশভক্তিমূলক গান রচনায়ও তাঁর সাফল্য সর্বোচ্চ পর্যায়েই প্রমাণিত। 'নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম', 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়', 'আমার শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের', 'আমার দেশের মাটি' ইত্যাদি কালজয়ী গানগুলো বহুকাল ধরে বাঙালির চেতনায় অমলিন আসন গেড়ে বসে রয়েছে।

নজরুল নিজে একজন অকুতোভয় সংগ্রামী সৈনিক ও স্বাধীনতার আপসহীন সংগ্রামী কর্মী হওয়ার দরুন তাঁর রচিত সংগ্রামমূলক গানগুলো বাংলা গানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল জায়গা লাভ করেছে। ভারতবর্ষকে বিদেশি ইংরেজ শাসনের কড়াল গ্রাসমুক্ত করার সংগ্রামকে তিনি এক পবিত্র কর্তব্যজ্ঞান মনে করেছিলেন। নজরুল সাহিত্যের অন্যান্য রচনাও ছিল সংগ্রামী মানুষের প্রেরণার সর্বজনীন উৎসস্বরূপ। পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুল রচিত যে সমস্ত সংগ্রামমূলক গান আমরা পাই তার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের সামগ্রিক মানসরূপটিই প্রত্যক্ষ করি। সংগ্রামমূলক এসব গানের মধ্যে কিছু গানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে; আর কিছু গানে জেলজুলুম ও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট', 'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে', 'চল্ চল্ চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'অগ্র পথিক হে সেনাদল'– ইত্যাদি সংগ্রামী ও জাগরণমূলক কালোত্তীর্ণ গানগুলো পরাধীনতার বিরুদ্ধে আজন্ম সংগ্রাম মুখর মানুষের চিরকালীন উদ্দীপনার উৎস। নজরুলের এই কালজয়ী দেশাত্মবোধক সংগ্রামী গানগুলো এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়নি, এই সৃষ্টি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেতনাজাত স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। ব্রিটিশবিরোধী স্বরাজ আন্দোলনের সভায় ও মিছিলে মিটিংয়ে নিয়মিত অংশগ্রহণ, কারান্তরিন যাপিত জীবনে নানাভাবে অত্যাচারিত হওয়া এবং অনশন পালন করার মধ্য দিয়ে যে যাতনাভোগ ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটেছে এসব গানে। নজরুল গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সংগ্রাম গড়ে তোলার শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনের প্রেরণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে শিল্প-সাহিত্যের মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে। কেননা, এর মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত মানুষকে অনুপ্রাণিত করা ও জাগিয়ে তোলা যায়। নজরুল যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তাই বাস্তবে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হতেন। নজরুল তাঁর রচিত সংগ্রামী সংগীত সকলকে বিরাট শক্তিশালী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এবং সে সময়ে চলমান হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সমাজ বাস্তবতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তিনি তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই সুসম্পন্ন করতে পেরেছেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ

মমতাজউদ্দীন আহমদ

বাবুল আকতার

মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৮ই জানুয়ারি ১৯৩৫–২রা জুন ২০১৯) একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী একজন ব্যক্তিত্ব। ২রা জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে তিনি পরলোকগত হয়েছেন। আমরা দেখি, মমতাজউদ্দীন আহমদের চেতনায় দ্রোহী, লেখায় অত্যন্ত ক্ষুরধার ও প্রাঞ্জল ভাব এবং অন্তরে গভীর প্রজ্ঞার প্রজ্বলন। বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতার পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে ধারাটি বিশেষভাবে বেগবানপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটা একমাত্র নাট্য-আন্দোলনেরই ধারা। এ কথাকে মৌলিক ভিত্তি ধরে বলা যায়, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে যে কয়েকজন প্রথিতযশা নাট্যকার ও নির্দেশক বিশেষভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে মমতাজউদ্দীন আহমদ একজন অন্যতম রূপকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেখালেখিতে মমতাজউদ্দীন আহমদ কখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবিক সংবেদশীনলতাকে অতিক্রম করে যাননি। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাস চর্চায়ও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁর রচিত 'বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। তাঁর রচিত নাটকে আমরা দেখি, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিপরীতে প্রতিবাদী ঘটনার সমাবেশ ঘটতে এবং সেখানে কোনো কোনো চরিত্রের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেই তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ছাত্রজীবনে মমতাজউদ্দীন আহমদের ছাত্র ইউনিয়ন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারটি হয়ত তাঁকে এই প্রতিবাদী হওয়ার সাহস জুগিয়েছে। তিনি রাজশাহী কলেজে বাংলাদেশের প্রথম শহিদমিনার নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ কতটুকু রাজনীতি সচেতন ছিলেন তা বুঝা যায় একটি বিষয়ে, সেটা হচ্ছে– তিনি ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে শুধু রাজনীতির কারণে কারাবরণ করেছিলেন। পেশাগত জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার পাশাপাশি সারাজীবন তিনি সাহিত্য সাধনা ও নাট্যচর্চা করে গেছেন। নাটকই যেন তাঁর প্রাণ। নাটক রচনা, নির্দেশনা দেওয়া, অভিনয় করা, নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নাটকের ইতিহাস রচনা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন করা ইত্যাদি ছিল তাঁর নিত্য অনুষঙ্গ। টেলিভিশন নাটক রচনায় তিনি এনেছিলেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা এবং টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করার সুবাধে তিনি পেয়েছিলেন বিপুল দর্শকপ্রিয়তা। মমতাজউদ্দীন আহমদের সংবেদনশীল অভিনয় দেখে মোহিত হননি এমন কোনো দর্শক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্লাসে কিংবা উন্মুক্ত কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতা, উপস্থাপন কৌশল এবং শব্দ চয়ন হতো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অসাধারণ আবেগমথিত। মমতাজউদ্দীন আহমদ সব ধরনের মঞ্চ নাটক রচনা করলেও এক অঙ্কের নাটক লেখায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সাক্ষর রেখেছিলেন। মমতাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ভারতের তৎকালীন মালদহ জেলায়, দেশ বিভাগের পর তার পরিবার তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। ছোটোবেলায় স্কুলের পড়াশোনা ভারতের মালদহে করলেও এদেশে চলে আসবার পরে রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর ৩৪ বছরেরও বেশি সময় তিনি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। তাঁর লেখা নাটক বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি শিক্ষক ও লেখক হিসেবে পরিচিতি পেলেও নাটক রচনা ও থিয়েটার চর্চাই তাঁর কর্মজীবনকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে তিনি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়কে উপজীব্য করে তাঁর লেখা বহু নাটক বাংলাদেশ বেতারেও প্রচার হয়েছে। শিক্ষকতা পেশার বাইরেও তিনি সরকারের একাধিক বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৬–৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এবং ১৯৭৭–৮০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে– 'কী চাহ শঙ্খচিল', 'হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'বকুলপুরে স্বাধীনতা' 'জমিদার দর্পণ', 'রাজা অনুঃস্বারের পালা', 'ক্ষত-বিক্ষত', 'রঙ্গপঞ্চাদশ', 'সাতঘাটের কানাকড়ি', 'রাক্ষসী', 'হরিণ চিতা চিল', 'প্রেম বিবাহ সুটকেশ' ইত্যাদি। নাটক ছাড়াও তার গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে আছে। 'বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত', 'ভাঁড় নয় ভবঘুরে নয়', 'আমার ভিতরে আমি', 'জগতের যত মহাকাব্য', 'শাহনামা কাব্যের গদ্যরূপ', 'জন্তুর ভিতরে মানুষ' ইত্যাদি। মমতাজউদ্দীন আহমদের সবচেয়ে মঞ্চ সফল নাটক হচ্ছে 'সাতঘাটের কানাকড়ি'। 'সাতঘাটের কানাকড়ি' সমাজ বাস্তবতার এক অনবদ্য ও হৃদয় ছোঁয়া মঞ্চ সফল নাটক। এই নাটকে স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারী চরিত্র যেমন এসেছে, তেমনি একইভাবে এসেছে আত্মবিশ্বাসহীন মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের ফোকলা চরিত্র এবং স্বৈরাচারী শাসকের ষড়যন্ত্রের জালে আটকে কীভাবে বিপ্লবী চরিত্রও সমাজ ও রাষ্ট্রে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাও এসেছে। দেখানো হয়েছে, আদর্শের অভাবে ভালো ছেলেরাও কীভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং মিথ্যা বানোয়াট ঘটনায় ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে মানুষ কীভাবে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এছাড়াও এই নাটকে দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধশিশুর বেড়ে ওঠা এবং একজন ধর্ষিত মা কীভাবে এক-এক করে তার সাত সন্তানকে হারিয়ে ফেলেন। এই নাটকের শেষপাদে এসে আমরা আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করি সন্তানহারা ধর্ষিত এই মা কীভাবে সারা বাংলাদেশের সমস্ত সন্তানের নিরঙ্কুশ মা হয়ে ওঠেন।

মমতাজউদ্দীন আহমদের এই 'সাতঘাটের কানাকড়ি' নাটকটি বাংলাদেশে সর্বাধিক মঞ্চায়িত নাটকগুলোর মধ্যে একটি। নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মমতাজউদ্দীন আহমদ 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার', 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা' ছাড়াও ১৯৭৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক অতুলনীয় অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাণী– 'সত্য যে কঠিন, তাই কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা' উল্লেখ করে তিনি বলেছেন– 'মানুষের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী– জীবনভর মানুষের যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছি তার কোনো তুলনা থাকতে পারে না। বাংলা ভাষার মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে আমি ধন্য, আমি পূর্ণ– এই দেশকে ভালোবেসে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে– জীবন আমার ধন্য হলো মাগো তোমায় ভালোবেসে– যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেব, তখন একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন নিয়েই বিদায় নেব'।

লেখক: সাহিত্যিক

গুজবে আতঙ্ক! আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

সম্প্রতি সারাদেশে বিরাজ করছে ছেলেধরা আতঙ্ক এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি গণপিটুনি ও এতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে যা খুবই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। কোনো সভ্য দেশে এ ধরনের প্রাণহানির ঘটনা নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। এই গণপিটুনি ও প্রাণহাণির পেছনে রয়েছে নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কার, যা একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পদ্মা সেতু নির্মাণে মানুষের মাথা লাগবে মর্মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি গুজব কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচার করে এবং এর ফলেই এই ছেলেধরা আতঙ্ক, গণপিটুনি ও প্রাণহাণি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কোমলমতি ও সরল। এ অঞ্চলের মানুষ সত্যাসত্য বিচার না করে সহজেই কোনো কিছু বিশ্বাস করে নেয়। জনশ্রুতি আছে, যে-কোনো বৃহৎ স্থাপনা গড়তে হলে সেখানে বসবাসরত অশরীরী সত্তা বিরক্ত হয়ে তাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ক্ষতি সাধন করে। ফলে নিজেদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা ও নির্বিঘ্নে সেই স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টরা এ ধরনের অশরীরী সত্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে থাকে। জীবন্ত পশুপাখি এমনকি মানুষের ছিন্ন মস্তকও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের এই অলীক ধারণাকে কেন্দ্র করেই আলোচিত এই গুজব ছড়ানো হয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে।

অশরীরী কোনো সত্তাকে সন্তুষ্ট করে কোনো স্থাপনা গড়া এবং তারজন্য জীবন্ত মানুষের ছিন্নমস্তক প্রদান করার এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে কি-না সন্দেহ আছে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা নিছক নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। যারা এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে তারা ধর্ম, নৈতিকতা, মানবিক মূলবোধ এমনকি দেশ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৩১শে জুলাই ২০১৯ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গুজব প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্যসচিব আবদুল মালেক এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

গুজব শব্দের আভিধানিক অর্থ জনশ্রুতি, রটনা বা জনরব। কোনো ভ্রান্ত তথ্য বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারই গুজব নামে অভিহিত। গুজব প্রচারের জন্য কোনো ভ্রান্ত তথ্যকে জনসমাজে এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন তা সাধারণের মাঝে বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাজে বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে একটি অন্যতম বৃহৎ স্থাপনা এবং তা নিয়ে সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ বিদ্যমান। তাই বহুল প্রচারের স্বার্থে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে এই গুজব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আশ্রয় নিয়ে তা দ্রুত সারা দেশে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ও রাষ্ট্রের চরম শত্রু। এদের নির্বুদ্ধিতার কারণে গণপিটুনি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, যা ধর্মবিরোধী ও আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ এবং প্রচলিত আইনের আওতায় এদের শাস্তি হওয়া উচিত।

আশার কথা হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী এ ধরনের গুজব সৃষ্টিকারী ও গণপিটুনির সাথে সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের উপযুক্ত শাস্তি হোক এমন প্রত্যাশা সকলের। প্রচলিত আইনে এর সাথে জড়িতরা শাস্তি পাবে ঠিক কিন্তু ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ

ক্ষেত্র থেকে যে-কোনো গুজব প্রতিরোধে সচেষ্ট ও সজাগ থাকতে হবে।

একথা নিশ্চিত যে-কোনো স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ গুজব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ঘটনার সত্যাসত্য বিচার না করে তা প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কোনো ঘটনা যাচাইবাছাই না করে তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া, তা প্রচারে সহায়তা করা, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা তার ভিত্তিতে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে আমাদের সবাইকে।

সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে আঘাত করা বা তার ওপর চড়াও হওয়া একটি ফৌজদারি অপরাধ। কারো চলাফেরা বা আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর সাহায্য নিতে হবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এমন কাজ কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরিউক্ত গণপিটুনির ঘটনা এমন মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া এবং কাউকে প্রহার করা চরম অন্যায় এবং অপরাধ। এই অন্যায় ও অপরাধ হতে আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে নিজেদেরকেই। একইসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে জড়িত সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে জনগণের আস্থা অর্জনের। মানুষ যেন বিপদে-আপদে তাদেরকে বন্ধুর মতো পাশে পায় এ প্রচেষ্টা তাদেরকে অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের সাহায্য ছাড়া আইনের শাসন সম্ভব নয়। পুলিশ প্রশাসন কিংবা বিচারবিভাগ– জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা ব্যতীত কারো একার পক্ষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সে কারণে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে হবে সবাইকে। সর্বসাধারণেরও উচিত আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে বরং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে দ্রুত সেবা নেওয়ার জন্য টোল ফ্রি ৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সমাজে গুজব ছড়িয়ে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেছে। হয়ত তারা সাময়িকভাবে কিছুটা সফলতা পেয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সত্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে সকল ক্ষেত্রে। সমাজে গুজব ছড়িয়ে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যেতে পারে কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য একদিন ঠিকই প্রকাশিত হয় এবং তা আপন মহিমায় হয় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। সত্য একদিন ঠিকই প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সাময়িক বিশৃঙ্খলার কারণে যে নিরাপরাধ মানুষগুলোর প্রাণহানি ঘটল তারজন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দোষারোপ করবে আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য। তাই আসুন আমাদের নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদের লজ্জা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখি।

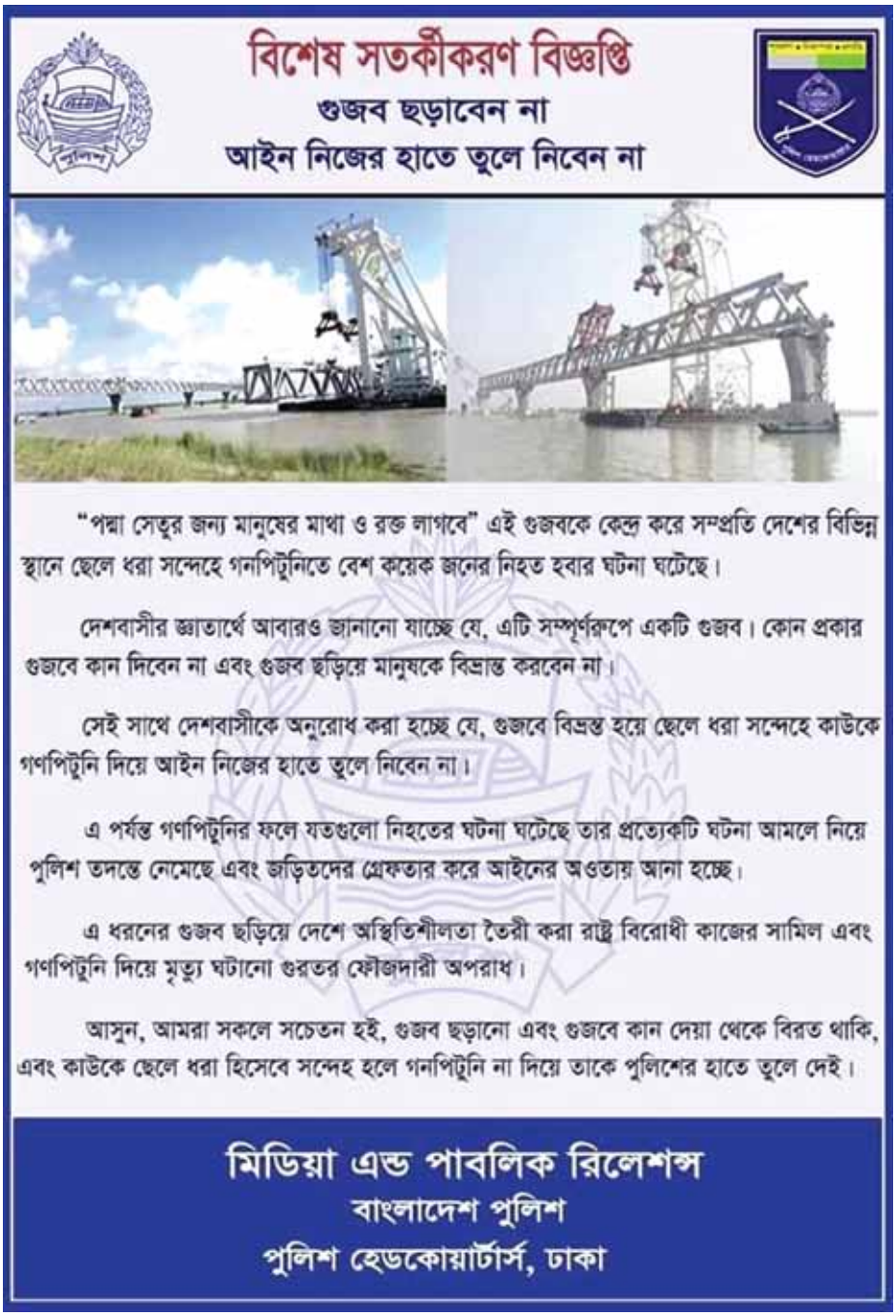

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, ঢাকা

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।
এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দু'টি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দু'জন প্রতিবাদী, কর্ণেল জামিল ও নাম না-জানা
এক তরুণ, যাঁর জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো।
তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবী,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিলো?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তম পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টেলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।
তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আর আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে...।
... তারপর ডেডস্টপ।
তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
– কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

রক্ত কলমে একশ বছরের কাব্য

মাসুদুর রহমান

এই রক্ত আঁখিপটে উদ্ভাসিত স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণ সূর্যগ্রহণ
এই রক্ত চোখের মণিকোঠায় শাশ্বত ব্ল্যাকআউট
এই রক্ত হৃদয়জুড়ে পদ্মা মেঘনা যমুনা
এই রক্ত আঁধার কালো স্রোতে শক্তির শোণিত ধারা
এই রক্তের রং এখনো কালো
এই রক্ত বিন্দুগুলো এক একটি অসভ্যতার রাষ্ট্রাচার
এই রক্ত বিন্দুগুলো সুপ্ত জীবন্ত গ্রহাণুপুঞ্জ
এই রক্তস্রোত নিগূঢ় কালো রাতের কালো জ্যোৎস্না
এই রক্তস্রোতের কালো গহ্বরে ধ্বংস হবে অসময়ের স্রোত
এই কালো রক্ত বিশুদ্ধ করে রক্ত লাল বিমুক্ত হৃদয়
এই রক্তস্রোত এখনো বয়ে যায় এখনো কালো
এই রক্ত লাল উজলা স্রোতে কেটে যায় কৃষ্ণ জলস্রোত
এই রক্ত শাশ্বত বুনো কালো স্রোত
এই রক্ত শরবতের গেলাসে অবিভক্ত কালো আঁধার
এই রক্ত রঙিন জলের ভেতর আলোর প্রতিসরণ
এই রক্ত সেঁটে আছে মানবতার বিবেকের দেয়ালে
এই রক্ত মেখে আছে মহাকালের শ্বেত শুভ্র পোশাকে
এই রক্ত নববধূর মেহেদি হাতে রাঙা আলপনা
এই রক্ত নিষ্পাপ শিশুর সবুজ জমিনে উদিত সূর্য
এই রক্ত নব জীবনের সিঁড়ি ধাপে সোনার বাংলা।

মুজিব তুমিই বাঙালির হৃদস্পন্দন

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাংলার সবুজ পত্র পল্লবে যেখানেই চোখ রাখি
সর্বত্রই মুজিব তুমি, তোমার দৃঢ় প্রত্যয়ী মুখ
ভেসে উঠে
স্বাধীনতা পতাকায় তোমাকে দেখি
তুমি, কেবলি তুমি পিতা দৃষ্টিজুড়ে,
শিশুদের কলকাকলিতে, বইয়ের পাতায়
ফুলের সুবাসে তুমি
তুমি আমাদের হৃদয়াবেগের ভাষা–
জাতীয় সংগীত
পথে প্রান্তরে মাঠে ঘাটে তোমারই বজ্রকণ্ঠ শুনি,
বটের ছায়ায় হিজল তলে কৃষকের কথোপকথনে মুজিব তুমি
তোমারই কণ্ঠ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়,
গ্রামগঞ্জে শহরে সভা সমাবেশে মুজিব তুমি
আনন্দ উৎসধারা।
সংসদে প্রাণচাঞ্চল্যে তুমি, আশা স্বপ্নে তুমি
কলকারখানায় রাজপথে মিছিলে স্লোগান তুমি
মুজিব তুমিই বাঙালির শক্তি সাহস প্রেরণা
মুজিব তুমি সূর্য নায়ক, তুমি বাঙালির স্বপ্ন বৈভব
তুমিই বাঙালির হৃদস্পন্দন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৯

মায়ের দুধের বিকল্প নেই

মিতা খান

আজকের শিশু আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই শিশু সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের দুধ সন্তানের অধিকার। মায়ের দুধ হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার এবং পানীয়। এতে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দি ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশন'-এর উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সমর্থনে ১৯৯২ সাল থেকে ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত পালন করা হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহটি'। বাংলাদেশসহ বিশ্বের মোট ১৫৫টি দেশে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে 'মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য– 'Empower parents, enable breastfeeding: Now and for the future' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে। এ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, 'মায়ের দুধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব পুষ্টিগুণ, যা শিশুকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখে এবং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায়'। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা মাতৃ ও শিশুপুষ্টি বিষয়ে এসডিজি অর্জনে সক্ষম হবো। এজন্য সরকারি, বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরভাবে কাজ করতে হবে'।

মহান সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠান তখন সে থাকে শিশু। তখন এই অবুঝ শিশুটির একমাত্র খাদ্য মায়ের বুকের দুধ। শিশু জন্মের পর প্রথম ঘণ্টার মধ্যে যে দুধ পান করে তা হচ্ছে 'শালদুধ'। চিকিৎসকদের মতে, এই শালদুধ একজন শিশুর প্রথম ভ্যাকসিন। এই শালদুধে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, স্নেহ ও ভিটামিন। এ শালদুধ শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করে এবং শিশুর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। যে-কোনো প্রদাহ বা ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা, বিকলাঙ্গতা, শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধ করে এবং শিশুর মৃত্যুর হার কমায়।

২০১৮ সালের মে মাসে ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নবজাতকের মাত্র ৫১ শতাংশকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। ৬ মাসের কমবয়সি ৫৫ শতাংশ শিশুকে কেবল বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। এ হিসাবে বিশ্বে ব্রেস্টফিডিংয়ে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। এ হার আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা

মাতৃদুগ্ধ শুধুমাত্র পুষ্টির উৎস নয়, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই মায়ের শরীরের পক্ষেও সমান উপকারী। জন্মের প্রথম ৬ মাস শিশুকে শুধু মায়ের দুধই খাওয়ানো উচিত। তার কারণ–

❑ মায়ের দুধ শিশুকে পাকাশয় ও অন্ত্রের সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এই দুধ তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং এতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয় না। এছাড়া এই দুধ শিশুর পাকাশয় ও অন্ত্রের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

❑ মাতৃদুগ্ধ শিশুর নাক ও গলার ঝিল্লির উপর আস্তরণ তৈরি করে হাঁপানি ও কানের সংক্রমণ থেকেও শিশুকে রক্ষা করে।

❑ গরুর দুধে অনেক শিশুর অ্যালার্জি হয়। সে তুলনায় মাতৃদুগ্ধ ১০০ শতাংশ নিরাপদ।

❑ সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে শিশুরা জন্ম থেকে মাতৃদুগ্ধ খেয়ে থাকে তাদের ভবিষ্যতে মোটা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ তারা খিদে অনুযায়ী খেতে শেখে। ফলে শুরু থেকেই তাদের অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা কম থাকে।

❑ শৈশবে লিউকেমিয়া হওয়া থেকে মায়ের দুধ রক্ষা করে। বড়ো বয়সে ডায়াবেটিস টাইপ-১ এবং উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে।

❑ মাতৃদুগ্ধে শিশুর বুদ্ধি বাড়ে। কারণ, প্রথমত শিশুর সঙ্গে মায়ের একটা বন্ধন তৈরি হয় এবং দ্বিতীয়ত মাতৃদুগ্ধে এমন সব ফ্যাটি এসিড থাকে যা শিশুর মগজের বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে।

❑ নবজাতকদের স্তন্যপান নতুন মায়েদের তাড়াতাড়ি ওজন কমাতে সাহায্য করে।

❑ গর্ভাবস্থার পরে বুকের দুধ খাওয়ালে স্তনে ও ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের আশঙ্কা কম থাকে। যত দিন খাওয়ানো যায়, তত আশঙ্কা কমে।

❑ মায়ের দুধ খাওয়ানোর কোনো খরচ নেই। তাছাড়া শিশুর সঙ্গে মায়ের মানসিক মিলন ঘটায় এবং মায়ের শারীরিক ছোঁয়াতে শিশু আরাম বোধ করে।

মায়ের দুধ মহান স্রষ্টার বিশেষ নিয়ামত। কারণ অনেক মা সন্তান হওয়ার পরও শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাওয়াতে পারে না। এক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। শিশুদের শারীরিক-মানসিক বিকাশের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি তিন মাসের পরিবর্তে ছয় মাসে উন্নীতকরণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে কর্মজীবী মায়েদের ভাতা প্রদান, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, বিনামূল্যে মাতৃত্ব সেবাদান ও শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য টিকা ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে শিশুমৃত্যুর হার সংক্রান্ত এমডিজি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করার জন্য ২০১১ ও ২০১৩ সালে দুইবার সাউথ সাউথ পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: কপি রাইটার, সচিত্র বাংলাদেশ

ডেঙ্গু জ্বরে সচেতন থাকুন

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

ডেঙ্গু জ্বরে অনেকের আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে, পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। রাজধানীবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, এ রোগের প্রকোপ আরো বাড়ার আশঙ্কা আছে, যা কিনা নাগরিক জীবনকে বেশ অস্থিরতায় ফেলতে পারে। নিজেদেরকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সকলের সচেতনতা নাগরিকদের জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। ঢাকা সিটি করপোরেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ মশক নিধনের অন্যান্য কার্যকর পদক্ষেপ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকলের সচেতনতা ও সর্বোচ্চ সতর্কতার মাধ্যমে এ ক্রান্তিকালীন দুরবস্থা নিরাময় করা সম্ভব।

ফ্ল্যাভিভাইরিডি (Flaviviridae) পরিবার ও ফ্ল্যাভিভাইরাস (Flavivirus) গণের অন্তর্ভুক্ত মশাবাহিত এক সূত্রক আরএনএ (RNA) ভাইরাসের সংক্রমণই হচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস বা ডেঙ্গি ভাইরাস যা ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী। এডিস ইজিপ্টি মশা (A.aegypti) ডেঙ্গু ভাইরাসসহ ইয়েলো ফিভার ভাইরাস, জিকা ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া ভাইরাসেরও বাহক। এই ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ পাওয়া গিয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণরূপে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবাণুবাহী এডিস মশা কাউকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ায় তাহলে সেই মশা ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এই জীবাণুবাহী মশাটি যখন অপর কোনো ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার দেহে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে খুব সহজে একজন থেকে অপরের দেহে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রধানত তিন ধরনের ডেঙ্গু হতে দেখা যায়–

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার-সাধারণত ভাইরাস জ্বরের যে লক্ষণ তার সব উপসর্গই ডেঙ্গু জ্বরে থাকে তবে জ্বর ১০৪-১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার– রক্তে প্লেটিলেট কমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম– ডেঙ্গু ভাইরাসের (Basically Immune Effect) ইফেক্টের ফলে রক্তনালীতে ছোটো ছোটো ছিদ্র তৈরি হয় বা আগের ছিদ্রগুলো বড়ো হয়ে যায়– ফলে রক্তের পানীয় অংশ রক্তনালীর বাইরে চলে আসে > রক্ত ঘন হয়ে যায় > রক্ত চলাচল কমে যায় > শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অরগ্যান বিশেষ করে ব্রেইনে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় > মানুষ দ্রুত মারা যায়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত অল্পদিনেই সুস্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থতা বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে।

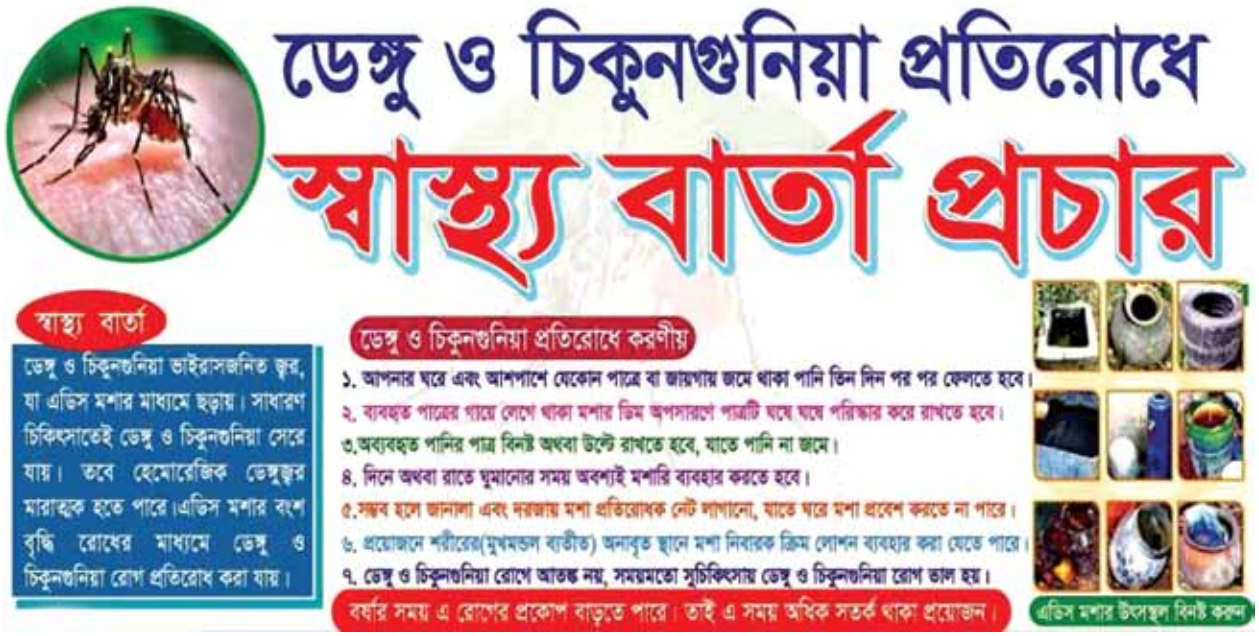

ডেঙ্গু জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে– সারা শরীরের মাংসপেশিতে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। ব্যথা, জ্বর হওয়ার ৪ বা ৫ দিনের সময়ে অ্যালার্জি বা ঘামাচির মতো সারা শরীরজুড়ে স্কিন রাশ বা লালচে দানা দেখা যায়। এ জ্বর কম বা বেশি উভয়ই হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর ১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। খাবারে অরুচি ও মাত্রাতিরিক্ত বমি (২৪ ঘণ্টায় ৩ বারের বেশি) হয়। রক্ত পরীক্ষায় রক্তে হেমাটোক্রিট (HCT) বেড়ে যায় এবং প্লেটিলেট কমতে থাকে। কখনো মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে আবার জ্বর আসে। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাথা ব্যথার সাথে শরীরেও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় এবং জ্বর থাকে। কখনো চোখের পিছনে ব্যথা অনুভব করে। যাদের বেশি জ্বর থাকে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন চামড়ার নিচ, নাক, মুখ, দাঁত ও মাড়ি, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাহিরে, কফ, বমি ও পায়খানার সাথে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আবার রোগীর রক্তনালী থেকে প্লাজমা লিকেজের কারণে বুকে ও পেটে পানি জমতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT - GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

পানিশূন্যতা বেশি হওয়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে, অনেক সময় লিভার আক্রান্ত হয়ে রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে। চিকুনগুনিয়া সাধারণত দ্বিতীয় বার হয় না তবে ডেঙ্গু দ্বিতীয় বার হলে জটিলতা আরো বেড়ে যায় বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। সাধারণত ৪ ধরনের ডেঙ্গু ভাইরাস-এর কারণে ডেঙ্গু জ্বরও ৪ বার হতে পারে।

করণীয়সমুহ- প্রচুর পরিমাণে পানি,শরবত ইত্যাদি তরল জাতীয় খাদ্য পান করা উচিত; ভিটামিন সি জাতীয় দেশি ফল বেশি করে খাওয়া উচিত, কারণ এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত, কারণ এটি রক্তের উপাদানের তারতম্য করাসহ নানাবিধ ক্ষতি করে; জ্বর হলে নিজে নিজে চিকিৎসা শুরু করা ঠিক নয়, ব্যথার ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি; এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা এমবিবিএস ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াটাই নিরাপদ; ডাক্তার রোগ নির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষা দেবেন তা অবহেলা বা দেরি না করে প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রিপোর্ট করে সেখানে যাওয়া উচিত। তবে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতাল সবসময়ই ভালো। সরকার ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের জন্য ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে (NS1 Antigen- সর্বোচ্চ 500/-; IgG & IgM (together) সর্বোচ্চ 500/; CBC (RBC+WBC+Platelet+ Hematocrit) সর্বোচ্চ 400/-)। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।

সাধারণত শহর এলাকায় এ জ্বরের প্রকোপ বেশি লক্ষ করা যায়। খুবই সাধারণ কিছু নিয়মকানুন যা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সবসময় সকলের সচেতনতার জন্য প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো মেনে চললে আমরা এ রোগের প্রকোপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। মশার প্রজননক্ষেত্র যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে। আতঙ্কিত না হয়ে মশা নিধন অভিযানে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়াসহ নতুনভাবে এ রোগের জীবাণুবাহী মশার আরো প্রসার না ঘটে সেজন্য সকলকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মশক নিধন অভিযানসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণের সচেতনতায় দুই সিটি করপোরেশনের অনেক কিছুই করণীয় আছে। সর্বোপরি ঢাকা শহরের জনসাধারণ সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এ রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

লেখক: কলামিস্ট

মহান পুরুষ

সাঈদ তপু

মহাকালের দিব্যি নিয়ে একটি মানুষ আসে
মাতৃপ্রেমে সিক্ত হয়ে দাঁড়ায় যে তার পাশে
কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করে দুঃখ তোমার কী?
তোমার কোলে জন্ম নিতে এমনি আসিনি
ঘুচিয়ে দিতে সকল ব্যথা, দুঃখ, জরা, ঘা
এই মাটিতে জন্ম আমার মাতৃভূমি মা
জনম ধরে কাঁদছ তুমি আঁচল গুঁজে গুঁজে
কেউ কখনো দেয়নি তোমায় উষার আকাশ খুঁজে
অপমানে মুখটি তোমার শুধুই কালো বরণ
এইতো আমি কথা দিলাম ছুঁয়ে তোমার চরণ
সকল আঁধার মুছে দিতে এই এসেছি আমি
আমার জীবন তুচ্ছ মাগো, তুমিই আমার দামি
ভয় পেয় না এখন তোমার কাঁদার সময় শেষ
আলোর আভায় দুঃখ হবে চির নিরুদ্দেশ
সবুজ আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে হাসবে আবার সুখে
তোমার পথের সকল বাধা এবার দেব রুখে
তোমার শরীর শুষে যারা রক্ত করে পান
অথচ সেই রক্তের আবার করুণ অপমান?
সইব না মা এই দেখ না নষ্ট ভূতের দল
কেমনে তাড়াই ফিরিয়ে এনে এই বাঙালির বল
এই বলে সেই মহান পুরুষ অঙুলি নির্দেশে
ডাকল সকল বাঙালিকে জাগল সবাই শেষে
মৃত্যুকে জয় করল ওরা আনল বিজয় ঘরে
কাঁপল না বুক একটুও সেই মামদো ভূতের ডরে
কাটল আঁধার মায়ের আকাশ ঝলমলানো বেশ
মা যে আমার নতুন নামে সোনার বাংলাদেশ।

সবার হৃদয়ে মুজিবুর রহমান

আবুল হোসেন আজাদ

এখনো ফুল ফোটেনি বাগিচায় পাখিরাও গায় গান
দোদুল বাতাসে দোল খায় মাঠে কাঁচাপাকা সোনা ধান
এখনো চাঁদ জোছনা ঝরায় রাতের আকাশ ছেয়ে
সবুজ ঘাস ভোরের শিশিরে ওঠে ঠিক যেন নেয়ে।
এখনো মাঝি বায় ভাটিয়াল গায়ে তার তুলে পাল
নাইয়র নিতে গাঁয়ের বধূরে চেপে ধরে হাতে হাল।
এখনো আছে বুড়ো বটগাছ কালের সাক্ষী হয়ে
কুলুকুলু রবে যায় নিরবধি ঢেউ ভেঙে নদী বয়ে।
এখনো ডাকে বউ কথা কও সবুজ পাতার ফাকে
ঘাসফড়িংরা লাফিয়ে বেড়ায় মাঠের আলের বাঁকে
নেই তুমি শুধু আমাদের মাঝে তাই সব ম্রিয়মান
তবু তুমি আছ সবার হৃদয়ে মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু-স্বাধীনতা আশ্চর্য শক্তিধর দুটি শব্দ

আতিক আজিজ

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা চারমাত্রার এই দুটি শব্দ কী আশ্চর্য শক্তিধর!
কী জাদুকরী এই সম্মোহনী শক্তি এই দুটি শব্দের
স্বাধীনতা, স্বপ্নময় এই একটি শব্দের জন্য কী উৎসাহ মানুষের, কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা সবার!
স্বাধীনতা এই একটি শব্দের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে প্রতিদিন
এই একটি শব্দের জন্য গ্রামের কৃষক, ছাত্র-জনতা, কারখানার উত্তাল শ্রমিক
মাথায় লাল শালু, কোমরে গামছা আর রাইফেল কাঁধে
বনে-জঙ্গলে ছুটে বেড়িয়েছে অহর্নিশ
হাতের অস্ত্র আর গোলাবারুদ খুঁজে ফিরেছে শত্রুর গোপন আস্তানা
স্বাধীনতা এই একটি শব্দের জন্য সবাই হাতের মুঠোয় জীবন রেখেছে
পাহাড়, নদী, ধানক্ষেত আর ধু-ধু মাঠ পেরিয়ে
হানাদার হননে হয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।
বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চে সোহরাওয়ার্দীর রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ
স্বাধীনতা, এই বর্ণময় একটি শব্দের জন্য সংঘটিত হয়েছে জীবন পণ মুক্তিযুদ্ধ
মা-বাবা, প্রিয়জন, প্রিয়মুখ এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে
সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের অলিগলি আর রক্তমাখা প্রান্তরে
নয় মাসের এই যুদ্ধের বিভিষিকায় কেঁপেছে আকাশ কেঁপেছে বাতাস
স্বদেশের নদী সাগর পাহাড় প্রান্তর
বাঙালি পৌঁছেছে তার কাঙ্ক্ষিত বিজয় গন্তব্যে, শত্রুমুক্ত হয়েছে স্বদেশ।
মুক্তিযুদ্ধের এই নয়টি মাস যেন নয়টি আগ্নেয়গিরি
এই নয়টি মাস যেন শ্বাপদসংকুল অরণ্য
এই নয়টি মাস যেন বিভিষিকাময় অথৈ সমুদ্র
এই নয়টি মাস যেন গা ছমছম করা বিরান প্রান্তর
স্বাধীনতা নামের এই একটি শব্দের জন্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে
হাজার হাজার মা-বোনের লাজুক সম্ভ্রম
এই মহোদয় শব্দের জন্য স্বামীহারা শোকাতুর স্ত্রীর অবিরল ক্রন্দন
এই একটি শব্দের জন্য ছেলেহারা মায়ের পথপানে অনিমেশ চেয়ে থাকা
এই একটি শব্দের জন্য ভাইহারা বোনের বেদনার্ত বুকে ধু-ধু মরুভূমি
এই একটি শব্দের জন্য তিরিশ লক্ষ শহিদের অব্যক্ত আত্মার আকুতি
সোদামাটির গন্ধে ভরা এই একটি শব্দ স্বাধীনতা বুকের রক্তে রঞ্জিত
বঙ্গবন্ধুর লাল-সবুজের পতাকা শোভিত হৃদয় রাঙানো আমাদের এই বাংলাদেশ।

অম্লান স্মরণিতে

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

শোকের পুষ্পদলের বদলে তোমার স্বপ্নরা এখন আলো ছড়ায়
ভূ-তলের অন্ধকার কেটে গেছে, সে অনেক অনেক বছর
এখন আমরা আর অশ্রুচোখে চাই না কারো করুণা ভিক্ষা
তুমি চেয়ে দ্যাখো মধুমতীর জল সকল নদীর স্রোতে বহমান।
তোমার শোকের বাণীরা এখন শক্তিতে মহিয়ান এবং অনির্বাণ
প্রকৃতির ঝড়ো ঝাপটায় কালো দ্যতিরা পালিয়েছে বহুদূরে
এখন আমরা পিতৃভূমিতে স্ব-স্ব ক্ষমতায় শনাক্ত হয়েছি
তুমি চেয়ে দ্যাখো সকল প্রাণিকুল তোমার পদাবলি গাইছে।
শ্রাবণের বাদলভেজা তোমার রক্ত-ঋণ দিল মহতী দীক্ষা
মহাশূন্যেও নক্ষত্ররাজি, এই সবুজ গাছগাছালি, দূরের মহাসাগর
শতবর্ষের পঞ্জিকা খুলে অভ্যুদয়ের প্রত্যাশার মিল খুঁজছে দিনরাত
তুমি চেয়ে দ্যাখো, অম্লান স্মরণিতে তোমার আবক্ষ ছায়া বিদ্যমান।

বঙ্গবন্ধু

শাহরুবা চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাই
বাঙালি জনতার বল
বঙ্গবন্ধুর জন্য আজো কাঁদে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জল।
আজীবন সংগ্রাম করেছেন জাতির
মঙ্গলের জন্য হে কল্যাণকামী
কল্যাণের দীপশিখায় আঁধার টুটে
স্বাধীন হয়েছে বঙ্গভূমি।
অক্ষয়, অব্যয় অমর হয়ে থাকবে
বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর কথা
নক্ষত্রসম উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে
হে শহিদ বঙ্গবন্ধু জননেতা।
বাংলার স্বাধীন ও স্বাধীনতার
সর্বাধিনায়ক-বাঙালি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তিনিই পরাধীনতার শিকল ভেঙে
রক্ষা করেছেন বাংলার মান।
যাঁর জন্ম না হলে হয়তবা
সৃষ্টি হতো না– বাংলার লাল-সবুজ পতাকা
দেখা হতো না– আমার সাধের ময়না;
গাওয়া হতো না আর– আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।
অথচ– যে বাংলার পলিমাটিতে
জন্মে গুচ্ছ গুচ্ছ চারা
যে বাংলার বুকে মাথা তুলে
দোল খায় সোনালি আঁশের চারা;
সেই বাংলার বুকেই বেড়ে উঠেছিল কিছু শকুন;
যারা ঠোকর বসায় জাতির পিতার বিশাল বক্ষে।
কাপুরুষ শকুনেরা খুবলে খায়
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির হৃদপিণ্ড।
ওরা বাঙালির কুসন্তান– ওরা ঘৃণিত
জনম জনম অভিশাপে দগ্ধ হবে
ওদের আত্মা।

ঈদ আওয়াজটি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

ঈদ আওয়াজটি শুনার সাথে সাথেই
আনন্দের সেই আলোকচ্ছটা
ঠিকরে বেরিয়ে আসে।
মানুষের ভেতরটা আন্দোলিত হতে থাকে।
আনন্দের অনুরণন ঘটে।
মনে শিহরণ জাগায়।
আত্মা পুলক অনুভব করে।
তখন ঝলকে ওঠে মানুষের মন, সমাজ, সংস্কৃতি।
মানুষ ভাসতে থাকে নিরন্তর এক ভালো লাগায়
চোখে মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের দীপ্তি।

শোকের ছায়া বয়ে যায় বাংলায়

বাবুল তালুকদার

পনেরো আগস্ট এলেই
কালরাত্রির কথা মনে পড়ে যায়
শোকের ছায়া বয়ে যায় বাংলায়।
আকাশ ও প্রকৃতি থম থম করে
বাঙালি মানুষের হৃদয় কোণে ভূকম্প সৃষ্টি হয়।
চারদিকে মানুষের ঢল নামে–
রাজপথে সারা বাংলার মানুষ আর মানুষ
বুকের কোণে কালো কাপড়ের ব্যাচ পরে
আমাদের জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে।
এই বাংলার প্রতিটি মানুষ
অন্ধকার থেকে আলোর ভুবন ফিরে পায়।
পায়ের নিচে মাটি পায়।
আজও জয়ের মাল্য পড়ে ঘুরে বেড়ায়
লাল-সবুজের বাংলায়
অথচ সব বাঙালিকে ছেড়ে
এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে
অচিন ভুবনে চলে যায়
আমরা আজও তাঁকে ভুলতে পারিনি
পারব না কখনো
তিনি আজ বিশ্ব মানবের মাঝে চির অমর।

কেউ হবে না তোমার মতো

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

কেউ হবে না তোমার মতো, কেউ হবে না আর
তুমি ছিলে মহান নায়ক স্বাধীন এ বাংলার।
তোমার কঠিন কণ্ঠে ছিল বজ্রপাতের সুর
তর্জনীটা তুললে তুমি কাঁপত সমুদ্দুর।
তোমার ডাকে কাঁপত ভূমি, কাঁপত আকাশ-বন
উঠত কেঁপে অত্যাচারীর ঠুনক সিংহাসন।
মুজিব তুমি জাতির পিতা, বীর বাঙালির প্রাণ
ফুলের বনে প্রথম ফোটা পুষ্পরেণুর ঘ্রাণ।
তোমার ডাকেই অস্ত্র হাতে যুদ্ধে গিয়েছিলাম
নিজের জীবন হাতের মুঠোয় আমরা নিয়েছিলাম।
দীর্ঘ ন'মাস লড়াই করে জীবন রেখে বাজি
শেষ করেছি শত্রুসেনার সমস্ত কারসাজি।
তুমিই দিলে অসীম সাহস, যুদ্ধ জয়ের তাড়া
তোমার নামে কলঙ্ক দেয় কোন সে হতচ্ছাড়া!
সর্বকালের শ্রেষ্ঠপুরুষ, জাতির জনক তুমি
তোমার নামে গর্বিত আজ তোমার জন্মভূমি।
এই যে সবুজ মুক্ত স্বদেশ তোমার নামেই পাওয়া
সর্ব হারিয়েও তোমার কাছে হয়নি কিছুই চাওয়া।
তোমায় পেয়ে সব ভুলেছি-দুঃখ-ব্যথা, ক্লেশ
তুমিই দিলে স্বাধীনতা, সোনার বাংলাদেশ।
কেউ হয়নি তোমার মতো, কেউ হবে না আর
এই বাংলা তোমার মুজিব, তুমি যে বাংলার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে

এম এ ফরিদ

লও হে অভিবাদন হে জাতির জনক
আশার প্রদীপ হৃদয় সঞ্চারী
আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জ্বালি
উন্নয়নের তুর্য ধ্বনি
আজ নেই ভেদাভেদ মাটি আর মানুষে
নেই ভেদাভেদ ধনী আর গরিবে
ভ্রাতৃ প্রতীম সৌহার্দ্য ভাব
সমন্বয়ে এক সাথে চলি
প্রশস্থ পথ দিয়েছে ডাক
ঝরা ঝঞ্ঝাট মুছে করি সাফ
তোমার দেওয়া ফলশ্রুতি।
পেছনে ফেরার সময় যে নেই
সম্মুখে আলোর পরশ খুঁজে পেয়েছি
হে আমার নিত্য দিনের কাণ্ডারি
একা বসে ভাবছিনে আর
তোমার ডাক সুপথের নির্দেশিকা।
জীবন যেখানে আলো ঝলমল
দিয়েছ খুলে শ্যামল বাসন্তি রং।
পথের ক্লান্তি মুছে গেছে সব
নতুনের গন্ধে আজ উদ্ভাসিত
দিয়েছ কোলে স্নেহ মমতা ভালোবাসা প্রেম
প্রসারিত দু'হাত বাড়িয়ে
কাছে টেনেছ আবেগ জড়িয়ে
উজার করেছ হৃদয়ের টান
এ দেশবাসীকে
প্রেম প্রীতি মায়া ডোরে।
এমনতো দেখিনি কখনো হে রাষ্ট্রপতি
করে ছিলে সব বিশ্ব বিধাতার ইশারাতে।
চির সত্য চির ভাস্কর
ভোরের আলোর মতো উদ্ভাসিত।
যত কার্যক্রম নীতি নির্ধারক
পলে পলে সাজিয়েছে স্তবকে স্তবক।
ভীরুতা নেই উদ্বেলিত মন বাংলার ইতিহাস স্বর্ণ উজ্জ্বল।
উদার আহ্বান
বিশ্বব্যাপী আনন্দের জয়গান
মৈত্রী বন্ধন দেশ হতে দেশ
প্রীতির সেতু অটল অনঢ়
রচিয়েছ বাঁধন কাঁধে রেখে কাঁধ
সাম্য মৈত্রী সকলে সমান।
বর্ণ নেই গোত্র নেই, নেই জাতি প্রথা ভেদ
এঁকেছ তুমি এশিয়ার বুকে বন্ধু প্রতীম পরিবেশ।
ঘরে ঘরে আজ জয়ের ঢঙ্কা
মেহনতি মানুষের হৃদয় বারতা
নেই দ্বন্দ্ব তোমাতে আমাতে
তুমি যুগ সৃষ্টা অর্নিবাণ।
তুমি চলে গেছ অনন্ত চরাচরে
বেহেস্তি নূরের আলোক সম্ভারে
আমি চেয়ে থাকি আবার আসিবে ফিরে
প্রতিদিন প্রত্যুষে ভোরের আজানে আজানে।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'

শিল্পী ভদ্র

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে,
সপরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে,
ভাবা হয়েছিল শেখ পরিবার–
চিরতরে হলো ছারখার।
হারিয়ে না গিয়ে চিরজীবী হলো,
বিশ্বখেলা রহস্যময় বড়ো।
ভাবি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়ে,
সংবাদপত্র অফিসে
আত্মজীবনী লেখা খাতাগুলো,
রয়ে গেল কেমন করে।
১৯৭৫ থেকে ২০০৪, ২১ আগস্টে,
২৯ বছর প্রায় পার হলো মাঝে!
রাজবন্দি থেকে নিভৃতে,
১৯৬৬-৬৯-এ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে,
১৯৫৫ সাল অবধি যে লেখাগুলো,
বঙ্গবন্ধু রেখেছিলেন লিখে।
২০০৪ সালের ২১ আগস্টে,
গ্রেনেড হামলায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে,
পিতার লেখা আত্মজীবনীর চারটি খাতা,
অকস্মাৎ পান কন্যা শেখ হাসিনা।
তাতে ছিল পিতার অভয়বার্তা–
'ভয় নেই মা' আমি আছি, তুই এগিয়ে যা।
বঙ্গমাতার হিসাব লেখা খাতাটি
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণ কাহিনি
৩২নং সড়কের বাড়ির আলমারির পরে,
সবার অলক্ষে গেল রয়ে।
এত মানুষ, এত আসবাব
হত্যা, ভাঙচুর, লুটপাট হলো,
খাতাগুলো শুধু অক্ষত রইল!
বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের ৩৬ বছর ৮ মাস পরে,
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ রূপ ধরে,
২০১২ সালের জুনে,
পৌঁছে গেল প্রতি ঘরে-ঘরে।
বইটি এত ভাষায় আজ প্রকাশিত–
কথাগুলো মোছা যাবে না কখনো,
কোটি গ্রেনেড হামলা করেও।

বঙ্গবন্ধু

রুমী ইসলাম

বঙ্গবন্ধু মানে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন
বঙ্গবন্ধু মানে ১৯৬৬-এর ছয় দফা
বঙ্গবন্ধু মানে ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন
বঙ্গবন্ধু মানে ১৯৭০-এর নির্বাচন
বঙ্গবন্ধু মানে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ
বঙ্গবন্ধু মানে ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস
বঙ্গবন্ধু মানে লাল-সবুজের পতাকা
বঙ্গবন্ধু মানে 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

পথপ্রদর্শক

নাহার আহমেদ

বাংলার এই প্রিয় অঙ্গনে
তোমার আসনখানি আজও শূন্য
সেখানে জমে উঠেছে ভালোবাসার মৌচাক
হাজার রঙিন স্বপ্নের মৌমাছির বসতি
যার সুধারস আমাদের জীবনকে
উজ্জীবিত করে রাখে।
সে শিখায় জ্বালিয়েছিলে
স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার মনোবলের
যে বীরত্ব জাগিয়েছিলে বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
শিরা-উপশিরায় অধিকার আদায়ের
তাতো নিভে যেতে পারে না।
সে শিখা আজও অনির্বাণ
বাঙালির অস্থিমজ্জায় প্রজ্বলিত
যে প্রতিবাদী শক্তি সঞ্চয় করেছি আমরা
একাত্তরে অগ্নি উত্তাপে, সেই অগ্নি স্নানে
আমরা সিক্ত হয়েছি।
যে মুক্তি মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল বাংলার
আকাশ-বাতাসজুড়ে
প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা অক্ষত থাকবে।
সাহসী বিদ্রোহী কলম সৈনিকেরা
আজও চলেছে জোর কদমে।
তাদের বোধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে
নির্ভীকতার সাথে।
তাদের থামিয়ে দেবার কোনো শক্তি
এই মাটিতে আর উদ্ভাবিত হবে না।
বাঙালি জাতিসত্তার আজন্ম শত্রুদের
ধ্বংস করতে,
স্বাধীনতা-বিরোধীদের শিকড় সমূলে
উপড়ে ফেলার জন্য
আমরা বদ্ধপরিকর।
আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কোনো অন্তরায়ই আজ
আমাদের রুখতে পারবে না।
ইতিহাস বিকৃত স্পর্ধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে
প্রতিবাদের মিছিলে নির্দ্বিধায় সবাই আমরা
একত্রিত হব। একাত্তরের সেই শক্তি দিয়ে
সেই শক্তির একমাত্র কর্ণধার, সেই শক্তির উৎস তোমার
ঐতিহাসিক বজ্রকণ্ঠের ভাষণ।
তোমার বলিষ্ঠতা, বিশ্বাস– আমাদের পথপ্রদর্শক।

এসেছে ইদুজ্‌জোহা

মোসলেম উদ্দীন

করি কোরবানি লয়ে আল্লাহ পাকের নাম,
তোমায় স্মরণে আনি ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম।
পশুত্ব তুমি করলে বিনাশ চালিয়ে খড়্গ কৃপাণ
করলে জয় মনুষ্যত্ব নবি অন্যতম মহান!
ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল দিয়ে পুত্রে কোরবানি
অমর শিক্ষা ইসলামের আমরা সবাই মানি।
শ্রেষ্ঠ তোমার হাতে তৈরি উপাসনালয় কাবা
ওরে মুসলিম ধনী অন্তত একবার সেথা যাবা।
বিশ্বের তাবৎ মুসলিম নরনারী সুখী কী দুঃখী
কে আছে হয়নি সালাতে আল্লাহর ঘর কাবামুখী।
তুমি মুসলিম জাতির পিতা নাই কারো এমন শ্রেষ্ঠত্ব
অন্য রাসুল নবিগণ তোমার ধর্মীয় ভাই স্বীকৃত।
বাঁচাতে তোমার শিশুপুত্র ইসমাইলে আরব মরুতে
বিবি হাজেরা মাতা পেরেশান সাফা-মারওয়া সায়ীতে।
সেথা আজও রয় জমজম কূপ আরো কত নিদর্শন
হাজীগণ হন ধন্য হজে করে কীর্তি দর্শন।
ত্যাগের শিক্ষায় তুমি দিলে দীক্ষা ভোগে নাই কোনো সুখ
আল্লাহর প্রেমে করি কোরবানি গরিব-ধনী কোলাকুলি বুকে বুক।

এলিজি

আহসানুল হক

আজকের দিন বিষণ্ন খুব, বিষাদে ভরা
আকাশে আজ ওঠেনি তো রোদ, চন্দ্র-তারা
মাঝির কণ্ঠে নেই গান, পাখির কণ্ঠে সুর
ফুল-পাখি-চাঁদ
ওদের বুক যেন আজ দুখের সমুদ্দুর।
এদিন ঘাতকের বুলেট নেয় কেড়ে জনকের কায়া
জনক মানে মুজিবুর, গভীর চোখের মায়া
মূর্খরা বুঝেনি তো কেউ
কায়া সরে গেলেও বেঁচে থাকে কীর্তি, স্বপ্ন ও আশা
মুজিব মানে বাংলাদেশ
ষোলো কোটি বাঙালির নিখাদ ভালোবাসা
মুজিব আছেন বেঁচে যুগ থেকে যুগে, যুগান্তরে
হৃদয়ের ঘরে
ঘাতকের বুলেট স্মৃতি তাঁর মুছবে কী করে?
একুশে, ৬-দফায়, সংগ্রামে-স্বাধীনতায়
মুজিব আছেন বেঁচে
লাল-সবুজে, বিজয় নিশানে, উড্ডীন পতাকায়
নদীর কলতানে শিল্পীর গানে কবির কবিতায়
জনকের নাম খোদিত আছে হৃদয়ের পাতায় পাতায়।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ

নুসরাত হক

আমরা চাই এমন এক সোনার বাংলাদেশ
যেখানে কখনো থাকবে না কোনো শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা
সত্যিকার সোনার মানুষ হয়ে সোনার দেশকে ভালোবেসে যেতে হবে।
তবেই দেশ হয়ে উঠবে এক সুখি সমৃদ্ধশালী স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।
এত রক্তের পর আমাদের এই স্বাধীনতা
সেটাকে ভালোবেসে বিফলে যেতে দেব না।
সকলকে আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ করে গড়ে তুলতে হবে
এক স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।
দুঃখী মানুষের দুঃখে এগিয়ে আসতে হবে
তবেই তো গড়ে উঠবে এক সৎ, সুন্দর ও স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ
ন্যায়-নীতি ও আদর্শে অটল থেকে কাজ করে যেতে হবে সকলকে
তবেই তো দেশ হয়ে উঠবে এক স্বপ্নের সোনার দেশ।
ক্ষণিক সময়ের এই জীবনে
এক নিঃস্বার্থ কর্মীর ন্যায় আমাদের দেশকে ভালোবাসতে হবে
তবেই হবে সব অন্যায়ের অবসান
আর গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলাদেশ।

উদ্যত আঙুলের ধ্রুপদী নৃত্য

অমিতাভ মীর

শাণিত ইস্পাতের মতো চমকিত বিদ্যুৎ প্রভার ঝলকে
একটি উদ্যত আঙুলের ধ্রুপদী নৃত্যের দমকে ঠমকে,
মিছিলের পদভারে কেঁপে কেঁপে ওঠে নগরীর রাজপথ;
জনসমুদ্রের বাঁধভাঙা ঢেউ মুক্তির উচ্ছ্বাস–
পল্টন ময়দান শোনে স্লোগান, শিহরিত যুগপৎ।
প্রশ্বাসের শব্দের অতলে সুনসান নীরবতা ভেঙে
ছমকে ছমকে উদ্যত সে আঙুল ধ্রুপদী নাচ নাচে,
বিমোহিত দৃষ্টি পলকে পলকে ছোটে মোহিত মঞ্চের তুকে;
ছলাৎ ছলাৎ ধমনীর ঢেউ শিহরণ তোলে বুকে
দিকভ্রান্ত পথিক পুড়তে ছুটেছে চৈতালি আঁচে।
ঠোঁটে উঠে আসে সেই চিরন্তনী শাশ্বত মুক্তির বাণী,
সাতই মার্চের উচ্চারিত সত্য শব্দমালা– কবিতা যার নাম;
ইস্পাতের মতো দৃঢ় উদ্যত তর্জনী ছিন্ন করেছে বন্ধনী,
বজ্র নিনাদে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত সেই শাশ্বত কবিতা–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
তারপর সব ইতিহাস, এল স্বাধীনতা, এল নির্ভীক কথা বলা,
বাংলা মায়ের ছায়ার তলে শঙ্কাহীন পথ চলা।
সেই ইতিহাস ভুলে যাবে– আছে কোথায় সে বেঈমান?
আমার সোনার বাংলার আমি এক গর্বিত সন্তান;
পিতা যার শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান।

হে বঙ্গবন্ধু! অসীম দূরদৃষ্টি তোমার

শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

১৯২০ সাল, হে বঙ্গবন্ধু! তুমি জন্মেছিলে
টুঙ্গিপাড়ার এক অজপাড়া গাঁয়ে,
চোখ মেলেই তুমি দেখেছ,
তোমার সোনার বাংলা আছে পরাধীন হয়ে।
ক্লাস ফোরের ছাত্র তখন তুমি,
দেখলে শীতে কাঁপছে বৃদ্ধফকির খালি গায়ে,
তা দেখে তোমার দয়ার মন উঠল কেঁদে,
আর তাই নিজের গায়ের কাপড় দিলে তাঁকে পড়িয়ে।
ক্লাস সেভেনের ছাত্র তুমি, কতটুকুই বা আর বয়স তোমার,
অথচ পথ আটকে দিলে প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলার,
বজ্রদীপ্ত দাবি ছিল একটাই,ছাত্র হোস্টেলের ছাদ,
মেরামত করে দিতে হবে চমৎকার।
কিশোরেই তোমার সাহস দেখে
মুগ্ধ হলেন নেতা শেরেবাংলা,
সেই কিশোর তুমি, আজ মোদের
জাতির পিতা '৭১-এ জন্ম দিলে সোনার বাংলা।
১৯৭২ সাল, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত,
ক্ষত-বিক্ষত তোমার সোনার বাংলা,
সাড়ে সাত কোটি মানুষের দিতে হবে,
অন্ন,বস্ত্র,শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা।
বুঝেছিলে তুমি তখনই
উৎপন্ন করতে হবে অনেক খাবার,
আর তাই প্রয়োজন ভালো বীজের
নইলে সোনার বাংলা হয়ে যাবে ছাড়খাড়।
তাই প্রতিষ্ঠা করলে তুমি বিএডিসি, এসসিএ,
১৯৭৩ সাল, তোমার পদভারে ধন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।
বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলে তোমার অবদান,
'আজ থেকে কৃষিবিদ তোরা ক্লাস ওয়ান'।
তুমি বলেছিলে, 'মান রাখিস তোরা আমার'
হে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু!
তোমার চির উন্নত শির, উঁচু রেখেছি বারবার।
আজ তাই তোমার সোনার বাংলায়
মাছ মাংস ভাতের নেই কোনো হাহাকার।

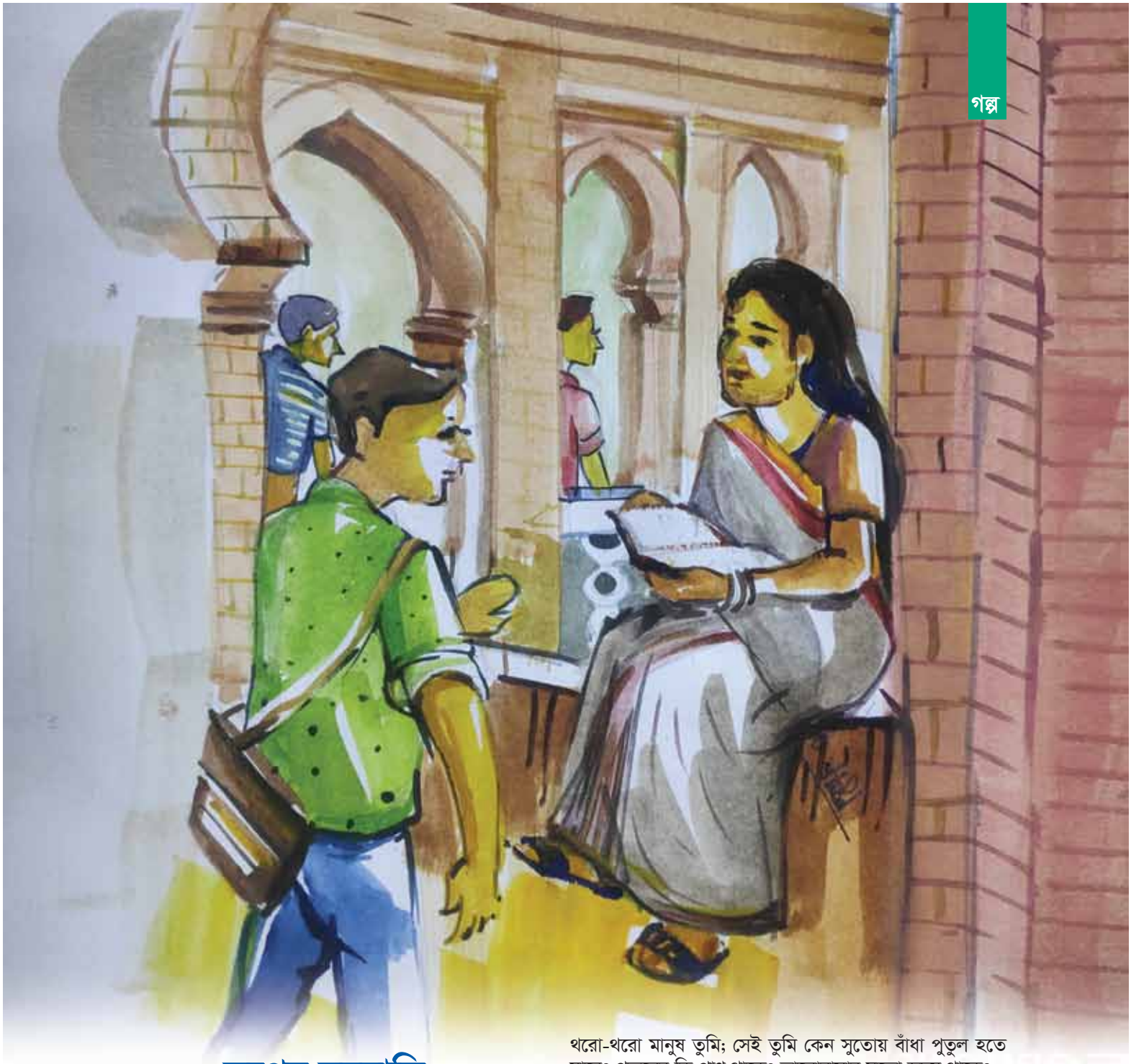

স্বপ্নের ঘরবাড়ি

রফিকুর রশীদ

স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন রচনা করা কি এক কথা হলো?

আমি বহুদিন ধরে অদিতিকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি স্বপ্ন দেখার উপরে মানুষের হাত থাক বা না থাক, স্বপ্ন রচনা করাটা একান্ত নিজের ব্যাপার। ইচ্ছেমতো, রুচিমতো, সাধ্যমতো ভাঙাগড়াও সম্ভব। কিন্তু স্বপ্ন দেখার পুরো প্রক্রিয়াটিই নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। স্বপ্নের ভেতরে মানুষ আর মানুষ থাকে না, চেনা চরাচরের বাইরে সেই ভিনজগতে প্রবেশের পর মানুষ হয়ে যায় দৃশ্যাতীত কারো হাতের সুতোয় বাঁধা নাচের পুতুল। এই সব আতালিপাতালি যুক্তির কথা বুঝিয়ে বলার পর অদিতিকে আমি প্রশ্ন করেছি– এমন আবেগ থরো-থরো মানুষ তুমি; সেই তুমি কেন সুতোয় বাঁধা পুতুল হতে যাবে? পুতুলের কি প্রাণ থাকে? ভালোবাসার মতো হৃদয় থাকে?

কে পুতুল নয় বলো?

অদিতি হুট করে ভারি এক দার্শনিক প্রশ্ন মেলে ধরে। তারপর নজরুলের গান থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে, গানের বাণী মনে নেই– খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে! খেলার পুতুল কিংবা নাচের পুতুল যাই বলো না কেন, পুতুল আমরা সবাই। আমি হা করে তাকিয়ে থাকি অদিতির মুখের দিকে। একান্তে ভাবি– বলে কী মেয়েটা! এমন ভারি ভারি কথা কবে শিখল? তবে কি সময়ের বাস্তবতা সবাইকেই যথাযথ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করে? হবে হয়ত বা। তাই বলে সেটা যে অদিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমন করে আমি ভাবতেই পারি না। অদিতি ঘুরিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করে–

তুমি কি তেমার ইচ্ছেমতো সব কিছু করতে পার?

সতিই আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, তাকিয়েই থাকি। অদিতি বলেই যায়, ইচ্ছেমতো চলতে পার? ইচ্ছেমতো বলতে পার?

সত্যিই আমি যেন আর যুক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারি না। চুপ হয়ে যাই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অন্তর্গত প্রশ্নের ঘাই কিছুতেই থামে না। স্বপ্নভূক এই মেয়েটিকে আমি কতটুকু জানি? চেনাশোনা নেহায়েৎ কম দিনের নয়। একই সঙ্গে ছাত্রজীবনের সুবর্ণ সময় কাটিয়ে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ধনাঢ্য পিতার খেয়ালি কন্যা। রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে গাড়ি হাঁকিয়ে ক্যাম্পাসে আসে-যায়, রাজ্যের বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহল্লা করে, ইচ্ছে হলে বিস্তর টাকা উড়িয়ে বন্ধুদের চাইনিজ খাওয়ায়, প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে কারও গায়ে, কাউকে হয়ত অকারণেই গাট্টা মেরে উঠিয়ে দিল নিজের পাশ থেকে, অন্য কেউ দ্রুত এসে শূন্যস্থান পূরণ করল–এসবই আমি দেখেছি নিরাপদ দূরত্ব থেকে। এই দূরত্বের পাঁচিল আমি নিজে থেকে কোনো দিন টপকাইনি। সহপাঠী হিসেবে অন্য সকলের মতো স্বাভাবিক পরিচয় ঠিকই আছে। এটা সেটা নিয়ে টুকিটাকি কথাবার্তাও হয়। আসলে ওর চরিত্রের বড়ো বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে– ডাঁট ফাট বলতে কিছু নেই। পরিচয়ের অনেক পরে আমার মনে হয়েছে ওর বুকের মধ্যে অতিশয় নির্মল ও স্বচ্ছ একটি ঝরনাধারা আছে এবং সেটি সতত প্রবহমান। সামনে যাই পড়ুক না কেন খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ঝরনাধারা।

বড়োলোক বাবার বিত্তবৈভব নিয়ে এক আধটু অহংকার থাকলেও অদিতির জন্যে সেটা বেমানান হয় না হয়ত। কিন্তু ওর সেসবের বালাই নেই। বন্ধুবান্ধবের পেছনে অকাতরে পয়সা খরচ করে বটে, সেটুকুও করে নাকি ওর নিজের আনন্দের জন্যে; এতে অন্যরাও যদি আনন্দিত হয় তাহলে সে হচ্ছে বাড়তি পাওয়া। অদিতির জন্যে সেটা পরম আনন্দের। রূপ-চেহারা নিয়েও অদিতির কোনো আদিখ্যেতা নেই। বিউটি কনটেস্টে নামার মতো সুন্দরী নয় সত্যি, তবু ওর নাক, মুখ, চোখ, ভুরু, ঠোঁট কোনটি যে অসুন্দর তা নির্ণয় করাও অসম্ভব প্রায়। নিজের এই সৌন্দর্য সম্পর্কেও অদিতিকে বরাবরই ভয়ানক উদাসীন মনে হয়েছে। ওর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাকানোরও উপায় নেই কারো। অমনি তার ঘাড় মটকে ধরে দুম করে মুখের উপর বলে দেবে– আমার দিকে ওরকম ড্যাব ড্যাব করে তাকাও কেন বন্ধু? ক্যাম্পাসে আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী আছে চোখে পড়ে না?

অদিতি এই রকমই। রাখা ঢাকার বিষয়টা যেন ভালো মতো বোঝেই না। যা মনে আসে তাই করে ফেলে, যা মুখে আসে তাই বলে ফেলে। আমি তো আমার জগৎ থেকে সবই দেখতে পাই, সব শুনতেও পাই। সনির্মিত দূরত্ব পাঁচিলের উপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে এসব দেখি আর একা একাই হাসি। মনে মনে বলি– কী যে পাগলামি মেয়েটার! এভাবেই চলছিল বেশ। এরই মধ্যে অনার্স ফাইনাল এগিয়ে এলে পরীক্ষার নোটপত্র আদান-প্রদানের সুবাদে আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগের সোপান রচিত হয়। কিন্তু সেটাও কি খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিকভাবে ঘটে? সেদিনের সে ঘটনা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। প্রানেশ স্যারের ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমরা বেশ কজন এক সঙ্গে নামছি আর্টস বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি ভেঙে, একেবারে শেষ মাথায় এসে অদিতির সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে আমার সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, কে যেন প্রশ্নই করে বসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে– কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ক্লাসে দেখলাম না যে। কারো কোনো কৌতূহলের জবাব না দিয়ে সোজা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুম করে বলে,

– এই শোনো?

আমি তো একেবারে হতভম্ব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, জিগ্যেস করি, আমাকে ডাকছেন?

– জ্বি জনাব। পরিহাস ছলকে ওঠে অদিতির কণ্ঠে, আপনাকে ডাকতে পারি না?

– না মানে, আমার সঙ্গে.....

– তোমার অত ডাঁট কীসের বলো তো?

– ডাঁট! আমার?

– আচ্ছা, আমরা কি পরস্পরের বন্ধু নই?

সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নাড়াই, ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই; সহপাঠী তো বটেই?

আমি বুঝতেই পারি না মূল আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে। আমার ডাঁটের কীইবা এমন দেখা গেল। আমি তা সকৌতুকে জানতে চাই,

– হঠাৎ বন্ধুত্বের কথা উঠছে কেন?

– তাই তো বন্ধুত্বের কথা উঠছে কেন? বন্ধু বলে তো তুমি স্বীকারই কর না।

– সে কী! সহপাঠী বন্ধু বললাম যে!

– বন্ধুকে কেউ আপনি বলে?

– বলে তো! আমি প্রায় সব বন্ধুকেই আপনি বলি।

– সে সব তাহলে বন্ধুত্ব না ছাই।

– না না, তা হবে কেন?

– তোমার ডাঁট তো ওইখানে– মুখে বন্ধুত্ব বলবে, কিন্তু অন্তরে দূরত্ব রাখবে।

– তোমার সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করে?

আমি সত্যিই খুব বিব্রত বোধ করি। বুঝতেই পারি না এ আবার কী ধরনের আলোচনার মধ্যে পড়লাম। আমি খুব বিনম্র ভঙ্গিতে বলি,

– তা ঠিক। কিন্তু এতদিন পর বন্ধুত্বের কথা উঠছে কেন?

– উঠছে, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই বলেই উঠছে।

এবার আমার ভিমরি খাওয়ার দশা। ওর দিকে ভালো মতো তাকাতেও পারি না। কোনো মতে ঢোক গিলে বলি– বন্ধুত্ব কি চাইবার জিনিস? হলে তো এমনিতেই হয়।

– হয়। তাহলে আমাদের হচ্ছে না কেন?

আমি আবারও অবাক হই। সারা ক্লাস জোড়া সবাই যার বন্ধু, তার কেন এই আদিখ্যেতা? বন্ধুত্বের জন্যে তার কেন এই কাঙালিপনা? আমি অদিতির চোখ-মুখের দুস্পাঠ্য আঁকিবুঁকি থেকে উত্তর খুঁজি– কী হয়েছে মেয়েটির? আমি একটু আশকারা দিয়ে একটু এগিয়ে এসে বলি,

– আমাদের তো বন্ধুত্ব হয়েই আছে। আবার নতুন করে হবেটা কী?

বড্ড খুশি হয় অদিতি। খপ করে আমার ডান হাত ওর মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলে, সত্যি বলছ কবির?

আমি নিজেকে গুছিয়ে ওঠার আগেই অদিতি আমাকে টেনে নিয়ে আসে বারান্দার চওড়া পিলারের আড়ালে। আমার দু হাত জড়িয়ে ধরে হঠাৎ করে বলে, আজ রাতে তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। উহ্! কী যে স্বপ্ন! স্বপ্ন নাকি দুঃস্বপ্ন কে জানে? আচ্ছা, তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলাম কেন, বলো দেখি!

এ প্রশ্নের জবাব দেব কী, আমার তো আকাশ ভেঙে পড়ে মাথায়। শুনেছি অদিতি এক প্রকার স্বপ্নগ্রস্ত মনুষ। বলতে গেলে সব সময় নাকি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই থাকে। গতবছর ওর নামে নববর্ষের খেতাবও জুটেছিল বেশ– 'স্বপ্নমানবী'। কেউ কেউ ওকে দেখে হিন্দি গানের সুর ভাঁজে 'মেরা ছাপ্পকা রানি...'-এ সবই আমি কিছু কিছু জানি। কখনো বিশেষ কৌতূহল দেখাইনি, এমনিতে নানাজনের

মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে আমার কান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আমি নীরবে শুনেছি। কিন্তু এতদিন পর আমার মতো নিভৃতচারী মানুষ যে অদিতির স্বপ্নের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে, এই সংবাদ আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে। অদিতি কিন্তু নির্বিকার। কত অবলীলায় বলতে পারে,

– বাব্বা! স্বপ্নের ভেতরেও তোমার যা ডাঁট।

– কী রকম?

আমি নির্লজ্জের মতো প্রেম নিবেদন করছি। অথচ তুমি আমাকে পাত্তাই দিচ্ছ না।

– এত বড়ো স্পর্ধা?

স্বপ্নে তো তাই দেখলাম। এখন বাস্তবে কী যে ঘটে কে জানে? আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু কেঁপে ওঠে। দুর্ভাবনায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তবু মুখে অম্লান হাসি ফুটিয়ে বলি,

না না, স্বপ্ন আর বাস্তবকে একাকার করে গুলিয়ে ফেললে চলবে কেন? বাস্তব আরো কঠোর, আরো নির্মম। বাস্তবের কষাঘাত সইবার মতো শক্তি সঞ্চয় করাটা সবার জন্যে জরুরি।

খুব ভয়াবহ কিছু শুনছে এ রকম ভঙ্গিতে লাফিয়ে ওঠে অদিতি।

– ওরে বাবা! তাহলে আমার স্বপ্নই ভালো।

– কিন্তু কেবলমাত্র স্বপ্নের ভেতরেই মানুষ বাঁচে না অদিতি, পায়ের তলে মাটি চাই। বাস্তবতার এঁটেল মাটি।

কপট ভ্রূভঙ্গি করে অদিতি আমার চোখে চোখ রেখে বলে,

– আচ্ছা, তুমিও যে ভারি জ্ঞানের কথা ঝাড়ছ দেখছি।

এটা বড়ো একটা জ্ঞানের কথা নয় কিন্তু। খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক কথা। থাক তোমার ঐ সাধারণ কথা। আমার সেই অসাধারণ গানই ভালো 'স্বপ্ন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা...'

অদিতি এরকমই আপাদমস্তক স্বপ্নময় মানুষ। স্বপ্নের মধ্যেই ওর দিন কাটে, রাত কাটে। কখনো যদিবা ঘুম ভাঙে তো স্বপ্ন ভাঙে না। সেই অদিতির স্বপ্নের মোহজালে পতঙ্গের মতো উড়ে এসে আটকে পড়ার মানুষের তো অভাব নেই। আমাদের সহপাঠী এবং সিনিয়র ভাইদের মধ্যে অনেককেই অদিতির চারপাশে ব্যাকুল হয়ে মাথা কুটতে দেখেছি, তাদের সবার পতঙ্গ জীবনের পরিণতির কথা ভেবে আমি দুঃখ অনুভব করেছি, কিন্তু ঈর্ষা বোধ করিনি কখনো।

কেবল একদিন বুকের বামপাশে ঈর্ষার মতো কী যেন এক গোপন কাঁটার খচখচানি অনুভব করি। খুব সূক্ষ্ম খুব গোপন। ইকবাল আমাদেরই সহপাঠী, সবাই জানে মেয়ে পটানোর যম। তাই বলে ম্যাডামকে পর্যন্ত পটিয়ে ফেলবে! যা খিটখিটে মেজাজ ফরিদা ম্যাডামের। ইকবাল সেই ফরিদা ম্যাডামের বাসা থেকে থার্ড পেপারের সাজেশন এবং নোট এনে আমার সামনেই অদিতির হাতে তুলে দেয়, সঙ্গে এক ডোজ পরামর্শের পুরিয়া– আজে বাজে নোট পড়ে আর কাজ নেই, বুঝেছ অদিতি! আমিই তোমাকে স্ট্রং সাজেশন এনে দেব। অদিতি অবলীলায় ঘাড় দোলায় এবং স্নিগ্ধ হাসিতে সম্মতি জানায়। এ ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া আমি ওকে জানতে দিতে চাইনি। অথচ পরদিন ক্যাম্পাসে এসে অদিতি নিভৃতে আমাকে বলে, গতকাল বাড়ি গিয়ে অগ্ন্যুৎসব করেছি।

আমি চমকে উঠি– মানে?

– ইকবালের সব নোট আগুনে পুড়িয়েছি।

বলো কী? আমি শিউরে উঠি। এদিকে অদিতি খিলখিল করে হাসতে থাকে।

এভাবেই অদিতি আমাকে পদে পদে জিতিয়ে দিতে চায়, বুঝিবা এভাবে জয় করতেও চায়। মাঝে মধ্যে একান্তে ভাবি– আমি কি এমন মানুষ, যে আমাকে জয় করার জন্যে কারো আবার সাধ্য সাধনার প্রয়োজন পড়ে। একটু সাদা চোখে তাকিয়ে দেখলেই টের পাই, খুব সযত্নে খুব নিপুণ হাতে অদিতি আমার চারপাশে স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে চলেছে। সে জালের সূক্ষ্ম তন্তু দৃশ্যমান হোক বা না হোক, নিশ্চয় তা প্রবল শক্তিশালী। সচেতনভাবে নিজেকে অহর্নিশ শাসাই– ওই মায়াবী জালে আটকা পড়লে আমার কিছুতেই চলবে না।

এ কথা বললে হয়ত পরিহাসের মতো শোনাবে– শৈশব থেকে বাবা-মা-ভাই-বোনের একরাশ স্বপ্ন আমাকে তাড়া করে চলেছে। নিভৃত পাড়াগাঁয়ের এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান আমি। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'– কী এক স্বপ্নমন্ত্র জপতে জপতে বড়ো হয়েছি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাবা মায়ের স্বপ্ন– খোকা বড়ো হলে তাদের দুঃখ ঘুঁচবে, ভাইবোনের স্বপ্ন– বড়ো ভাই নিশ্চয় আমাদের কথা ভাববে। এই সব স্বপ্নেরা সেই কবে থেকে ডালপালা মেলে চলেছে, শুধু কি ডালপালা, এতদিনে পত্রপুষ্পে ঘন ছায়াবীথি রচনা করেছে; আমার সাধ্য কী সেই ছায়ার বিস্তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই। তাই আমি মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই আমার ক্লাস ওয়ান এর শিশুপাঠ্য ছড়ায় ফিরে যাই, মনে মনে আওড়াই অ-তে অজগর আসছে তেড়ে, স্বপ্নগুলো নেবে কেড়ে।

একরাশ স্বপ্নের তাড়া খেয়ে হাঁপিয়ে ধুঁকিয়ে এত পথ এসে এখন যদি সামনেই দেখি স্বপ্ন গহ্বর, তাহলে আমার কী করা উচিত? অদিতি যতই আমার চোখের সামনে স্বপ্নের সোনালি ঝালর টাঙিয়ে দিক, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়, দু চোখের মণি ছিটকে বেরুতে চায়। তখন আমি কিছুই বলতে পারি না। বাগযন্ত্রও যেন বা আড়ষ্ঠ হয়ে যায়।

অথচ অদিতির দু চোখ ভরা স্বপ্ন। পেয়ালা উপচে পড়ার মতো কানায় কানায় পূর্ণ। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে এলো, এখন সংসারী হবে। উপযুক্ত জায়গা থেকে একাধিক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে বাড়িতে, অদিতির কারণেই সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে পরীক্ষার অজুহাতে। কিন্তু পরীক্ষাও যে ফুরিয়ে এলো, তারপর? অদিতির সোজাসাপটা হিসাব–তারপর আবার কী? আমরা বিয়ে করে ফেলব। ঘর বাঁধব। আমার প্রবল হাসি পায়। হা হা করে হেসে উঠি। অদিতি আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাসি থামাতে চায়। আমাকে আশ্বস্ত করতে সে জানায়,

– বাবা মা মেনে নিলে ভালো। না নিলেও অসুবিধা নেই। আমার নামে দশ লক্ষ টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট করা আছে, ভাবনা কী?

আশ্বস্ত হবার বদলে আমার ভেতরে তোলপাড় করে হাসির বন্যা এসে আছড়ে পড়ে। মনে মনে আমারই ভয় করে–এই বেয়াড়া হাসির তোড়ে কিন্তু স্বপ্নগ্রস্ত মেয়েটি ভেসে যাবে! আহা ঘর বাঁধার কী যে স্বপ্ন! প্রতিদিন স্বপ্নের মধ্যেই ঘর সাজায় ঘর গোছায়। অথচ এই শহরের অনেক সাজানো গোছানো ঘর অপেক্ষা করছে ওরই জন্যে। কিন্তু না, ও চায় স্বপ্নের ঘরসংসার এবং সেটা আমার মতো একজন স্বপ্নতাড়িত ও সন্ত্রস্ত বেকার যুবকের সঙ্গে। তা কিছুতে হয়! আমি ওকে জীবনের করুণ বাস্তবতার গদ্য বুঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো কাজে লাগে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ দিনটিতে সে কী বুক ভাঙা কান্না ওর! যেন বা নদী ভাঙনের মুখে দাঁড়ানো মানুষের আতঙ্ক ওর চোখে মুখে। আমি তখন কী বলে আশ্বস্ত করি। মমতার রুমালে মুছিয়ে দিই অদিতির চোখের তটিনি উপচানো অশ্রু রেখা এবং বলি– স্বপ্নের ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের মাটিতে পা রাখো, আমাকে পাবে নিশ্চয়। আমিও ওই মাটিতেই খুঁজছি আমার দাঁড়াবার জায়গা। হোক স্বপ্নের ঘরবাড়ি, তবু সেটা মাটির উপরেই গড়তে চাই।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২রা জুলাই ২০১৯ আশকোনায় হজ অফিসে হজ কার্যক্রম ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

হজ ব্যবস্থাপনায় কোনো প্রকার অবহেলা, অনিয়ম নয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, হজ ব্যবস্থাপনায় কোনো প্রকার অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। কোনো ব্যক্তি বা এজেন্সির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ২রা জুলাই রাজধানীর আশকোনায় হজ কর্মসূচির-২০১৯ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। হজের সময় মক্কা ও মদিনায় হাজিদের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। এ বছর সরকারের তত্ত্বাবধানে ৬ হাজার ৯২৩ জনসহ মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ৯২৩ জন হজ পালন করতে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পর্যায়ের 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৯' প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

চেইন অব কমান্ড মেনে দায়িত্ব পালন করুন

সর্বস্তরে চেইন অব কমান্ড মেনে বাহিনীর ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৬ই জুলাই ২০১৯ ঢাকা সেনানিবাসে পিজিআরের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি আপনারা ভিআইপিদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে খুবই আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। পিজিআরকে দেশের গর্বিত সেনাবাহিনীর একটি বিশেষায়িত অংশ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পিজিআরের দায়িত্বের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে বেড়েছে। আগামী দিনগুলো এই বাহিনীর সুনাম বজায় রাখতে আপনাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে অনিয়ম প্রতিরোধ করুন

মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সব ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৭ই জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৯' উপলক্ষে বঙ্গভবনের দরবার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রপতি বলেন, এ খাতে যারা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা হবে। জলাশয়ে মৎস্য অবমুক্ত করাসহ সব ধরনের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করেন, মৎস্য খাত দেশের আমিষের চাহিদার ৬০ শতাংশের যোগান দেয়। অধিকন্তু দেশের ১১ শতাংশের বেশি লোক জীবন ও জীবিকার জন্য এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। তাই মৎস্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে সমাজ থেকে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ দূর করতে সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য সুস্থ সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে সবাইকে এগিয়ে

আসতে হবে। ১৮ই জুলাই ২০১৯ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা হলে 'শিল্পকলা পদক-২০১৮' বিতরণ অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, আকাশ সংস্কৃতির কারণে আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতিতে ভিনদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতি সবকিছুই বর্জন করতে হবে। ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি অত্যন্ত ভালো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এবার সাতটি ক্যাটাগরিতে মোট সাত জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে নিজ নিজ অঙ্গনে অসামান্য অবদান রাখার জন্য শিল্পকলা একাডেমি পদক-২০১৮ প্রদান করা হয়।

জনগণের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য জনগণ নয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এখন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য– হচ্ছে জনগণের সেবা দান করা। তাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার বিকল্প নেই। মনে রাখবেন, 'জনগণের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য জনগণ নয়'। ২৩শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস- ২০১৯' উপলক্ষে 'জনপ্রশাসন পদক-২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি ছেলেধরা গুজব নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে সুযোগ সন্ধানীরা যেন ফায়দা লুটতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বছর জনসেবায় ইতিবাচক অবদানের জন্য ৪৫ জন কর্মকর্তা ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে 'জনপ্রশাসন পদক-২০১৯' প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদনঃ প্রসেনজিৎ কুমার দে

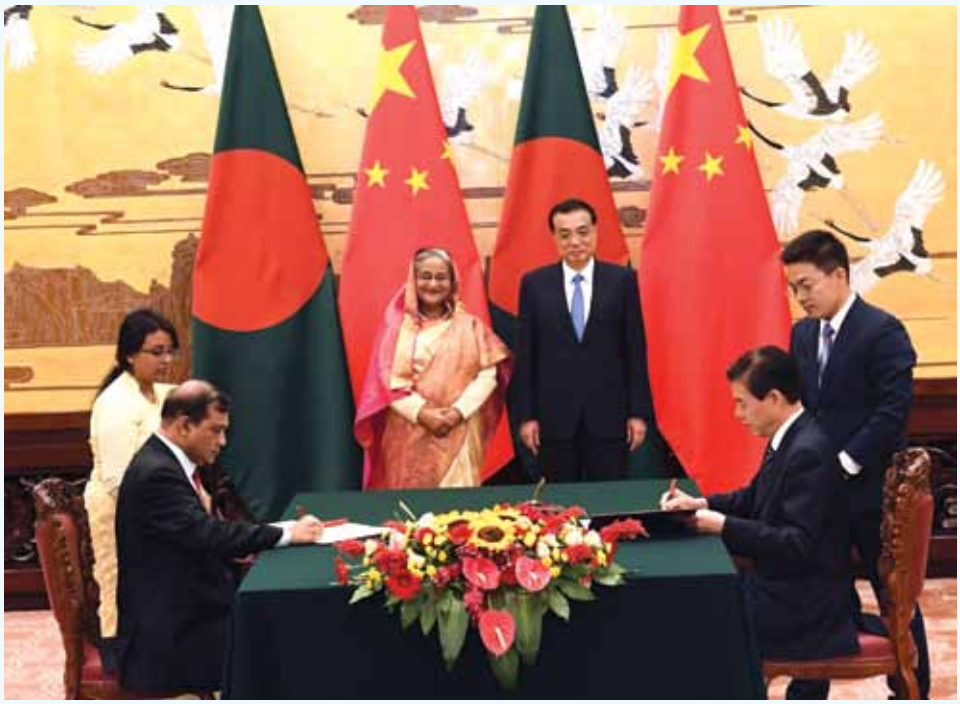

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী Li Keqiang-এর উপস্থিতিতে ৪ঠা জুলাই ২০১৯ বেইজিং-এর দ্য গ্রেট হল অভ্ দ্য পিপল-এ দু'দেশের মধ্যে ঋণচুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরঃ ৯টি চুক্তি স্বাক্ষর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জুলাই বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য চীন সফরে যান। চীন সফরকালে চীনের লিয়াংনিং প্রদেশের দালিয়ান আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং 'কো-অপারেশন ইন দ্য প্যাসিফিক রিম' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির মূল উদ্বেগ নিরসনের লক্ষ্যে ৫টি প্রস্তাব পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি চীনের বেইজিং-এর লিজেনডেল হোটেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত এক নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। বেইজিং-এর গ্রেট হল অব পিপলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং বৈঠক করেন। বৈঠককালে রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে, মর্যাদা ও নিজস্ব পরিচয়ে নিজ দেশে ফেরত যেতে পারে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে চীনের ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারকে রাজি করানোর চেষ্টার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। বৈঠক শেষে দুই নেতার উপস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার অংশ হিসেবে ৯টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ সময় দুই দেশের মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেইজিংয়ের দিয়াওতাই স্টেট গেস্ট হাউসে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাঁর দেওয়া নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংতাও সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবে বলে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী চীনের জাতীয় বীরদের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানান এবং ৬ই জুলাই দেশে ফেরেন।

জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জুলাই ঢাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দুইদিনব্যাপী জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের দ্রুত ফেরার পথ তৈরি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সবাইকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সচেতন থাকতে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব

পালনের অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গ্লোবাল কমিশন অব অ্যাডাপটেশনের সহযোগিতায় আমরা জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সঠিক অভিযোজন কৌশলের পাশাপাশি সাশ্রয়ী পন্থা ও ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থার সুবিধা পেতে চাই'। এলক্ষ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় অগ্রগামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে একটি 'রিজিওনাল অ্যাডাপটেশন সেন্টার' স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করতে সকলের প্রতি অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী।

ইসলামি পর্যটনকে বিশ্ব বাণিজ্যে ব্র্যান্ড করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ঢাকা দ্য ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম ২০১৯' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ইসলামি পর্যটনকে বিশ্ব বাণিজ্যে ব্র্যান্ড হিসেবে বিকশিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। এলক্ষ্যে সার্বিক প্রয়াস ও রোড ম্যাপের প্রয়োজন অতি জরুরি বলে উল্লেখ করেন। তিনি আন্তঃওআইসি পর্যটন প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটির সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভিসা সহজীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পর্যটন কেন্দ্রিক খাতগুলোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই তেজগাঁও-এ তাঁর কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১১ই জুলাই ২০১৯ এসকট হোটেলে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের ইয়াং লিডারস্ ফেলোশিপ প্রোগ্রামের গ্র্যাজুয়েশন উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারি সব সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশে চলমান উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে কাজের গতি আরো বাড়ানোর নির্দেশও দেন। সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনোভাবেই বঞ্চনা ও হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার কথা উল্লেখ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সার্বিক উন্নয়ন করতে গেলে সুশাসন একান্তভাবে দরকার। উন্নয়নের ছোঁয়াটা যাতে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌঁছায় সেলক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে। এজন্য জেলা প্রশাসকদের ও তাদের জায়গা থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে'। এলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকদের ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তি ও মানবিকতা রক্ষায় প্রয়োজন চলচ্চিত্র

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদ নিরসন এবং শান্তি ও মানবিকতা সংরক্ষণে চলচ্চিত্র অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ২২শে জুলাই রাজধানীর গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান মিলনায়তনে 'ফিল্মস ফর পিস ফাউন্ডেশন' আয়োজিত দুদিনব্যাপী 'পিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপ্তির এ যুগেও মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে ও সমাজকে শান্তির পথে এগিয়ে নিতে চলচ্চিত্রের বিকল্প নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রটিয়ে দেওয়া পদ্মা সেতুতে বলিদানের গুজব আর সেই থেকে ছেলেধরা আতঙ্ক এবং অসহিষ্ণু মানুষের গণপিটুনিতে নির্দোষ প্রাণের মৃত্যু– এসব রুখতে প্রয়োজন সহিষ্ণুতা আর শান্তির পক্ষে সচেতনতা।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গত কয়েক বছরে তথ্য প্রবাহের ক্যানভাস আমূল বদলে গেছে। আগে মানুষকে তার মতামত-অভিযোগ জানাতে পত্রিকার আশ্রয় নিতে হতো, আর এখন কেউ চাইলেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে লাখ লাখ মানুষের কাছে তার কথা পৌঁছাতে পারে। মানবিকতাবোধ আর শান্তিরক্ষার শপথে বলীয়ান থাকলেই কেবল অশান্তি-হানাহানি এড়ানো সম্ভব। উল্লেখ্য, এ ফেস্টিভ্যালে ২২-২৩শে জুলাই বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ২০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এক সাথে দেশ গড়ার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যুক্তি-তর্ক, আলোচনা-সমালোচনার গণতান্ত্রিক পথে সবাইকে এক সাথে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ১১ই জুলাই ঢাকায় ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত ইয়াং লিডারস ফেলোশিপ গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আলোচনা- সমালোচনা, যুক্তি-তর্ক হচ্ছে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চার মূলবিষয় এবং এটির মাধ্যমে

গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দায়িত্বে থাকলে সমালোচনা হবেই। সেই সমালোচনা শোনার মানসিকতাও থাকতে হয়। বর্তমান সরকার সেই মানসিকতা পোষণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি লালন করেন, সেই কারণে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য কম হলেও তারা যে সমালোচনা করেন তা থেকে অনেকগুলো গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের চার মাসব্যাপী ইয়াং লিডারস ফেলোশিপ গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির তৃণমূল পর্যায়ের ৩০ জন তরুণ নেতা অংশ নেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১লা আগস্ট ২০১৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব আবদুল মালেক এবং প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

নবনির্মিত তথ্য ভবনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১২ই জুলাই ২০১৯ বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

মুন্সী জালাল উদ্দীন

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই বছর মেয়াদি এ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক মুন্সী জালাল উদ্দীন। কমিটির অপর ১৬টি পদে নির্বাচিতরা হলেন– সহ-সভাপতি মো. শাহেনুর মিয়া ও মো. মনিরুজ্জামান, যুগ্ম-মহাসচিব পরীক্ষিৎ চৌধুরী ও মো. আবু নাছের, কোষাধ্যক্ষ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য, সাংগঠনিক ও আন্তঃসার্ভিস সচিব মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দীন, প্রচার প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, কল্যাণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সচিব আকতারুল ইসলাম ও দপ্তর সচিব নাসরীন জাহান লিপি।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন- মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোঃ আসিফ আহমেদ, মোহাম্মদ আবুল খায়ের ও মোহাম্মদ শফিউল্লাহ। সংগঠনের নিয়মানুসারে বিদায়ী কমিটির সভাপতি কামরুন নাহার ও মহাসচিব ফায়জুল হক পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৩ই জুলাই নতুন কমিটির অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং তথ্য সচিব।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

১লা জুলাই : নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'গুণগত শিক্ষা: প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ'

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ দিনের সরকারি সফরে চীনে যান। ২রা জুলাই চীনে দালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সভায় 'কো-অপারেশন ইন দ্য প্যাসিফিক রিম 'শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর উদ্বোগ নিরসনের লক্ষ্যে পাঁচ দফা প্রস্তাব উদ্‌যাপন করেন। ৪ঠা জুলাই চীনের গ্রেট হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং লি কোরিয়াংয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, বৈঠক শেষে বাংলাদেশ এবং চীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার অংশ হিসেবে ৯টি স্বাক্ষর হয়

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত

৬ই জুলাই: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্যভাবে 'আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস' পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'ন্যায়সঙ্গত ও সমুচিত কাজের জন্য সমবায়'

প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

৮ই জুলাই: সদ্যসমাপ্ত চীন সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন

একনেক সভা

৯ই জুলাই: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই ২০১৯ তাঁর কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সাত হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৩ প্রকল্প অনুমোদন হয়

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রধানমন্ত্রী

১০ই জুলাই: ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ঢাকা মিটিং অব দ্য গ্লোবাল কমিশন অন্য অ্যাডাপটেশন (জিসিএ)-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

১১ই জুলাই: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'জনসংখ্যা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন'

ঢাকা দি ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম ২০১৯ উদ্‌বোধন

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুদিনব্যাপী 'ঢাকা দি ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম ২০১৯' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডিসিদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

১৪ই জুলাই: তেজগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান

শেখ হাসিনা ইয়োন বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সফররত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি নাক-ইয়োনের বৈঠকের পর দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারকসহ তিনটি দলিলে স্বাক্ষর করা হয়

একনেক বৈঠক

১৬ই জুলাই: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় পাঁচ হাজার ১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে আট প্রকল্প অনুমোদন হয়

এইচএসসি ফল প্রকাশ

১৭ই জুলাই: এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এইচএসসিতে গড় পাস ৭৩.৯৩%

দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

১৭-২৩শে জুলাই: সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯' উদ্‌যাপিত হয়। ১৮ই জুলাই কেআইবি মিলনায়তনে মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়। উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মৎস্য সপ্তাহে'র এবারের স্লোগান ছিল– 'মাছ চাষে গড়বো দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'

জনপ্রশাসন পদক প্রদান

২৩শে জুলাই: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জনপ্রসাসন পদক-২০১৯ প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে ৪৫ জন ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে পদক দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু

দেশের একমাত্র দিনাজপুরের পার্বতীপুর বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং ইউনিট ১০ই জুলাই সরকার থেকে চালু হয়েছে। তিনটি ইউনিটের মধ্যে ১২৫ মেগাওয়াট প্রথম ইউনিটটি চালু হয় ২০০৬ সালের জুন মাসে। নতুন ইউনিট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে, এই ইউনিট উৎপাদনে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ হবে ও লোডশেডিং অনেকাংশে কমে যাবে।

ইলিশের উৎপাদন ৫ লাখ টন

দেশে ইলিশের উৎপাদন ৫ লাখ টন ছাড়িয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ ১৭ হাজার টন। মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ২ লাখ টনের বেশি। মৎস সম্পদের মজুদের জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করতে সরকার নোয়াখালী জেলার হাতিয়ার নিজুম দ্বীপসংলগ্ন ৩ হাজার ১৮৮ বর্গকিমি. সমুদ্র এলাকাকে প্রথমবার 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জেলেদের সঞ্চয়ী করার পাশাপাশি তাদের আপদকালীন জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে সাড়ে ৩ কোটি টাকার একটি 'ইলিশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ তহবিল' গঠন করা হয়েছে।

ভ্যাট আদায়ে ইএফডি

অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করতে ইএফডি (ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস) কিনবে সরকার। ২৪শে জুলাই সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব মেশিন এবং সামগ্রী কিনতে সরকারের ব্যয় হবে ৩১৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। এ মেশিনগুলো ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে। এর মূল্য ব্যবসায়ীদের পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, হোটেল, মিষ্টির দোকান, আসবাব বিপনন কেন্দ্র, বিউটি পার্লার, কমিউনিটি সেন্টার, মেট্রোপলিটনে অবস্থিত শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, অন্যান্য বড়ো মাঝারি পাইকারি ও খুচরা প্রতিষ্ঠানে ইএফডি স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। চলতি অর্থবছর থেকেই এটির ব্যবহার শুরু হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

লন্ডনে দূত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি দূতদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে বিনিয়োগের আরো সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা ও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে হবে।' যুক্তরাজ্যের লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশি দূতদের সম্মেলনে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ২১শে জুলাই প্রথমবারের মতো এই দূত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত ১৫ জন রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও স্থায়ী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন, অভিবাসন ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয় সম্মেলনে। সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমাদের চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে'। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একটি কার্যকরী এবং সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেন। যাতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর ও নিবিড় হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে জুলাই ২০১৯ সেন্ট্রাল লন্ডনের তাজ হোটেলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের 'দূত (ইউরোপ) সম্মেলন' এ বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেন 'বাংলাদেশে এখন একটি বৃহৎ দক্ষ জনশক্তি রয়েছে, যারা বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম'। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে এমন একটি অ্যাপ চালু করেছি, যার মাধ্যমে জনগণ ৯টি ভাষা শিখতে পারছে'।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে অর্জন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের চীন সফরে অপ্রত্যাশিত অর্জন হয়েছে। চীন সফরের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো দীর্ঘ দিনের রোহিঙ্গা সংকটে দ্বিপক্ষীয় সমাধানে বিশ্বের তৃতীয় পরাশক্তি এ দেশটির পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস আদায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় বিশ্বের বড়ো বড়ো সকল দেশ ও জোটের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভের পর এবার চীনের কাছে থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সহযোগিতার আশ্বাস আদায়ের পাশাপাশি দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি বড়ো সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানিসম্পদ ও পর্যটনসহ ৯টি খাতে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের আশ্বাস এবং সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে ৬ই জুলাই দেশে ফিরেছেন তিনি।

হার্ভার্ড সেমিনারে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সহযোগিতা চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রোহিঙ্গাদের টেকসই ও স্থায়ী প্রত্যাবাসনে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। ১৯শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের অ্যাশ সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারে এক সম্মেলনে এ আহ্বান জানান। বোস্টনের অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুল্লাহ শিবলী, ড. ডেভিড ড্যাপাইচ ও সমাজকর্মী নাসরিন শিবলী আন্তর্জাতিক রোহিঙ্গা সচেতনতা সম্মেলন শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর রোহিঙ্গা সংকট কী প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়টি সম্মেলনে তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, মিয়ানমার এই সংকট সমাধানে এগিয়ে আসেনি। কফি আনান কমিশনের সুপারিশ থেকে শুরু করে কোনো উদ্যোগই তারা বাস্তবায়ন করেনি। রাখাইন রাজ্যে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার আস্থা ও নিরাপত্তার অনুকূল পরিবেশই তারা সৃষ্টি করেনি। এর পরিবর্তে মিয়ানমার বিষয়টি নিয়ে দোষারোপের খেলা খেলছে। এই সংকট সমাধানে বিশ্ব বিবেককে এগিয়ে আসতে হবে। হার্ভার্ডের অ্যাশ সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স অ্যান্ড ইনোভেশন-এর পরিচালক অ্যান্থনি সাইচ রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। এই সংকট সমাধান না হলে এর পরিণতি কতটা ভয়াবহ অবস্থার দিকে যেতে পারে তাও তুলে ধরেন অর্থনীতি ও রাজনীতির এই বিশ্লেষক।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাইয়ের গেটওয়ে 'পরিচয়' চালু

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় 'পরিচয়' ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করেন। ১৭ই জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ওয়েবসাইটটির উদ্‌বোধন করা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ ১৭ই জুলাই ২০১৯ আগারগাঁওয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করার ওয়েবসাইট 'পরিচয়' (www.porichoy.gov.bd) উদ্‌বোধন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয় বলেন, সরকারি সেবাগুলো সহজে ও দ্রুততম সময়ে জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে চাই আমরা।

সভাপতির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে সরকার বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সেবাকে ডিজিটালাইজড করছে। তেমনই এক যুগান্তকারী সেবা হচ্ছে 'পরিচয়'। 'পরিচয়' সম্পর্কে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, 'পরিচয়' হচ্ছে একটি গ্রেটওয়ে সার্ভার; যা নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ডাটাবেসের সঙ্গে সংযুক্ত। এটি এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং যা সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তিগত যে-কোনো সংস্থার গ্রাহকদের, তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করে নিমিষেই সেবা দিতে পারবে। কোনো ব্যক্তি যা সংস্থা পোর্টালটিতে নিবন্ধের মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট ফি দেওয়া সাপেক্ষে কোনো নাগরিকের এনআইডি তথ্য যাচাই করতে পারবেন। এনআইডিতে একজন নাগরিকের প্রায় ২৫ ধরনের তথ্য থাকলেও এনআইডি নম্বর থেকে ৫-৬টি তথ্য যাচাই করা যাবে এই ওয়েবসাইটে। এগুলো হচ্ছে নাগরিকের নাম, বাবা ও মায়ের নাম ঠিকানা, জন্ম তারিখ ইত্যাদি। তবে এসব তথ্য পেতে কোনো সংস্থা ব্যক্তিকে কত টাকা ফি দিতে হবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণে কমেছে দুর্নীতি: জয়

দ্রুতসময়ে একটি দেশকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম বাংলাদেশ ছাড়া খুব কম দেশই পেরেছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেন, 'সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করায় দুর্নীতি কমে এসেছে। দ্রুত সময়ে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজড হয়েছে'। ১০ই জুলাই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সংসদ সচিবালয় আয়োজিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় তথ্য ও প্রযুক্তি' শীর্ষক কর্মশালায় সজীব ওয়াজেদ জয় একথা জানান। কর্মশালায় সজীব ওয়াজেদ জয় আরো জানান, সরকার এরইমধ্যে ই-গভর্নমেন্ট ও ই-ফাইলিং সেবা চালু করেছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা ডিজিটালাইজড হওয়ায় দুর্নীতির সুযোগ কমে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতেই আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারি। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। ফলে অর্থ ও সময়ের অপচয় অনেকাংশে কমে এসেছে বলে জানান তিনি।

এছাড়া শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে। বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে তরুণরা যাতে করে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে, সেজন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষায় তরুণদের গড়ে তুলতে হবে বলে জানান সজীব ওয়াজেদ জয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতে নতুন উচ্চতায় বাংলাদেশ

ভারতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি নতুন মাইলফলকে পৌঁছেছে। প্রথমবারের মতো রপ্তানি আয় ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এমন সাফল্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক থাকা

শ্রীপুরে লিড সনদ পেল ডেকো গার্মেন্টস

৬৭টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক ছাড়া আর কারো নেই।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতে ১২৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এর আগের অর্থবছরে ৮৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। তার মানে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় ৪২ দশমি ৯২ শতাংশের মতো বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ তথ্য থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ভারতে পণ্য রপ্তানিতে বড়ো ধরনের সাফল্যের পেছনে তৈরি পোশাক বড়ো ভূমিকা রেখেছে। মোট রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশই তৈরি পোশাক। বিদায়ী অর্থবছরে ৪৯ কোটি ৯০ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তরা। রপ্তানির এই পরিমাণ আগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ৭৯ শতাংশ বেশি। ওই অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ২৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। রপ্তানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পোশাক ছাড়া সয়াবিন তেল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি, প্লাস্টিক পণ্য, ইস্পাত ও চামড়াজাত পণ্য সহায়তা করেছে।

এত প্রবৃদ্ধির কারণ শিল্প ও সেবা খাত

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ পেরোনোর পেছনে শিল্প ও সেবা খাতই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই দুটি খাতের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির জন্যই বিদায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৮ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। ১৮ই জুলাই প্রকাশিত এডিবির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুকের সম্পূরক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে (২০১৭-১৮) বাংলাদেশে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সম্পূরক প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বিদায়ী অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আগের বছরের প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে এডিবি আরো বলেছে, জিডিপির অনুপাতে বিদায়ী বছরে বিনিয়োগের অংশও বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১ দশমিক ২ শতাংশের সমান বিনিয়োগ ছিল। এবার তা বেড়ে ৩১ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের প্রবৃদ্ধির হিসাব দিয়েছে এডিবি। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রবৃদ্ধি আগের চেয়ে বাড়লেও ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার তা কমতে পারে বলে মনে করছে দাতা সংস্থাটি।

লিড সনদ পেল ডেকো গার্মেন্টস

গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা এলাকার তৈরি পোশাক কারখানা ডেকো গার্মেন্টস লিমিটেড 'গ্রিন ফ্যাক্টরি বা সবুজ কারখানা' হিসেবে 'লিড' সনদ পেয়েছে। ৯ই জুলাই কারখানার অভ্যন্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সনদ হস্তান্তর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) বিভিন্ন মানদণ্ডের বিবেচনায় এ সনদ দিয়ে থাকে।

কারখানা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ডেকো গার্মেন্টস নির্মাণের সময়ে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কারখানায় সূর্যের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার। পানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা ও পুর্নব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট গণভবনে ১৭ই জুলাই ২০১৯ এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকার কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। ৬ই জুলাই চাঁদপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কোনো শিক্ষার্থী যে পর্যায়ে গিয়েই শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হন কিংবা সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি আর উচ্চ শিক্ষা নেবেন না, তারও যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে শিক্ষা পদ্ধতিতে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি শিক্ষার্থীদের ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে শিক্ষার পাশাপাশি মানবিকতা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ শিক্ষার আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে সব সরকারি কলেজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভার সভাপতিত্ব করেন। সভায়

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ ১০ই জুলাই ২০১৯ হুমায়ূনের সঙ্গে তাঁর অফিসকক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত Hu-Kang-il সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে সব সরকারি কলেজ। তিনি দেশের সব জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওই অঞ্চলের কলেজগুলো অধিভুক্ত করার নির্দেশনা দেন।

ভবিষ্যৎকে সঠিকভাবে তৈরি করতে ইতিহাস জানতে হবে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২২শে জুন ঢাবি'র ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত ৪৯তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন।

তুরস্কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের রাশেদ

উদ্‌বোধনকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের অতীত গৌরব তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন ইতিহাস বিনির্মাণের খুঁটিনাটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন সরকার। সরকার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বাংলাদেশ স্টাডিজ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযুক্ত করেছে। নারী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনঃ মো. সেলিম

বিনিয়োগঃ বিশেষ প্রতিবেদন

বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত স্থান। বাংলাদেশ সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করছে। বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে সরকার ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। এখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিনিয়োগকারীরা সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন। বিশ্বের অনেক বিনিয়োগকারী ইতোমধ্যে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছে। মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশ সরকার উভয় দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে একমত। ১১ই জুলাই ২০১৯ বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস মালয়েশিয়া সাউথ সাউথ অ্যাসোসিয়েশন ও মালয়েশিয়ার এক্সটার্নাল ট্রেড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের সহযোগিতায় মালয়েশিয়ায় আয়োজিত 'শোকেস বাংলাদেশ ২০১৯ গো গ্লোবাল-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ, মালয়েশিয়ার আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ও শিল্প উপমন্ত্রী ড. ওয়াং কিয়াং মিং, বাংলাদেশের বায়রার সভাপতি বেনজির আহমেদ এমপি, মালয়েশিয়ার নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, উভয় দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

চামড়াসহ সম্ভাবনাময় শিল্পে কোরিয়ান বিনিয়োগে শিল্পমন্ত্রী আহ্বান

চামড়াসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোরও অনুরোধ জানান তিনি। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এদেশের উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়ার অংশীদারিত্ব উল্লেখ করার মতো। এটি অব্যাহত রেখে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারের মাধ্যমে উভয় দেশেই লাভবান হতে পারে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হু ক্যাং-ইল ১০ই জুলাই ২০১৯ শিল্পমন্ত্রীর সাথে মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় বাংলাদেশের শিল্পখাতে কোরিয়ার বিনিয়োগ, শিল্পপ্রযুক্তি স্থানান্তর, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে সফরসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়।

দক্ষিণ করিয়ার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পায়নের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এক সময় দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম থাকলেও শিল্পায়ন, উদ্ভাবন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশটির অর্থনীতি বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বাংলাদেশের পরিশ্রমী জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে এদেশ অল্প সময়ের ব্যবধানে অথনৈতিক স্বাবলম্বিতার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্প খাত দক্ষিণ কোরিয়ায় বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন।

আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীদের প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে সরকার প্রদত্ত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে যুক্তরাজ্যসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী ৬ই জুলাই ২০১৯ লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ' আয়োজিত এক বিনিয়োগ সভায় বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন খাতের দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ ও হাইকমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বিগত ১০ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ করে আইসিটি খাতে বিনিয়োগকারীদের জন্য হাইটেক পার্ক স্থাপন, আমদানি-রপ্তানির ওপর শুল্ক হ্রাস/প্রত্যাহার প্রণোদনাসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধার বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের অবহিত করেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

রন্ধনবিদ্যায় পুরস্কার জিতলেন বাংলাদেশের আলপনা হাবিব

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে 'রন্ধনবিদ্যার অস্কার' হিসেবে পরিচিত গোরম্যান্ড কুকবুক অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন রন্ধনশিল্পী আলপনা হাবিব। ৪ঠা জুলাই চীন নিয়ন্ত্রিত ম্যাকাওয়ে ২৪তম 'গোরম্যান্ড ওয়ার্ল্ড কুকবুক অ্যাওয়ার্ডস ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। আলপনা হাবিব তাঁর রচিত আলপনা'স কুকিং বইয়ের জন্য এই পুরস্কারটি পেয়েছেন।

রন্ধনবিদ্যায় পুরস্কার হাতে আলপনা হাবিব

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ বছর এই পুরস্কারের জন্য ২১৬টি দেশ ও অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন করা হয়েছিল। প্রথম বই ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ১২টি বইয়ের মধ্যে থেকে

বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেমবন

২০১৮ সালের সেরা বইয়ের পুরস্কারটি পায় আলপনার বইটি। উল্লেখ্য, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ১৯৯৫ সালে প্রথম 'গোরম্যান্ড কুকবুক অ্যাওয়ার্ড' প্রদান শুরু হয়। আলপনা'স কুকিং ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে ভর্তা থেকে শুরু করে কাচ্ছি বিরিয়ানি পর্যন্ত জনপ্রিয় ২৫০টি রেসিপি রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর

বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ক্যামেরুনের মার্সি মিয়াং টেমবন। ৩০শে জুন থেকে তিনি বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ে দাযিত্ব পালন শুরু করেন। বাংলাদেশের পাশাপাশি তিনি ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। শিক্ষা খাতের বিশেষজ্ঞ হিসেবে মার্সি মিয়াং ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংকে যোগ দেন।

পুরস্কৃত হলেন নবীন সাত নারী উদ্যোক্তা

নবীন সাত নারী উদ্যোক্তা পেয়েছেন 'কালারস প্লাটিনাম বিজনেস উইমেন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯'। ২০শে জুলাই ঢাকায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সিটি ব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন কালারস এ পুরস্কার দিয়েছেন।

সাতটি আলাদা ক্যাটাগরিতে যারা পুরস্কার পেয়েছেন তারা হলেন– ফ্যাশন হাউস ওয়ারাহর স্বত্বাধিকারী রুমানা চৌধুরী এনচনটেড ইভেন্টস অ্যান্ড প্রিন্টসের সুসান খান, কারিগরের তানিয়া ওহাব, নীলা অ্যান্ড সসের আমেনা খাতুন, সুগার কমিউনিকেশনসের তৃণা ফাল্গুনী, চামড়া খাতের প্রতিষ্ঠান লা মোড়ের ফাহমিদা ইসলাম এবং উদ্যাক্তাদের অফিস সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান মোড়ের নাবিলা নওরীন ও নাহিদ শারমিন।

জেলা-উপজেলায় জমি পাবেন নারী উদ্যোক্তারা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশনের বিসিক শিল্পনগর রয়েছে যেসব জেলা-উপজেলায় সেসব জায়গায় নারী উদ্যোক্তাদের জমি বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। এর বাইরে প্রতিটি বাজার ও বিপনি বিতানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ কোটা বা কর্নার রাখা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ২০শে জুলাই রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির 'প্রগ্রেসিভ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭-১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ইতিহাসে প্রথম কোনো নারী ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন। তিনি হলেন

জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী উরসুলা ভন ডার লেন। ২রা জুলাই ব্রাসেলসে ইইউর সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সভায় এ মনোনয়ন দেওয়া হয়।

জার্মানির ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উরসুলা ২০১০ সাল থেকে রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য তৈরি হচ্ছে ১৮৫০টি ফ্ল্যাট

শেরেবাংলা নগরে সরকারি চাকরিজীবীদের আবাসনের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৪৩ একর জমিতে এক হাজার ৮৫০ থেকে দুই হাজার পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি চাকরিজীবীদের ৪০ শতাংশ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের আওতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে এক হাজার ৫১২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরে গণপূর্ত অধিদফতর কর্তৃক ১৭টি আবাসন প্রকল্পের আওতায় সাত হাজার ৮৭০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান।

সম্প্রতি সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং বৈঠকে উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ এসব তথ্য জানান।

বৈঠকের কার্যবিবরণীতে জানা যায়, কমিটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৪০ শতাংশ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ ঢাকার শেরেবাংলা নগরে পুরনো একতলা ও দোতলা ভবনগুলো ভেঙে সেখানে প্রায় ১০ হাজার ফ্ল্যাট তৈরির সুপারিশ করে।

এসব বিষয়ে মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের জন্য ফ্ল্যাট বা আবাসনের ব্যবস্থা করছে সরকার। বর্তমানে আট শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সুবিধা পাচ্ছেন। সরকারি চাকরিজীবীদের আবাসনের জন্য বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

গণপূর্ত সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার বলেন, শেরেবাংলা নগর এলাকায় দোতলা বিশিষ্ট ই, এফ, জি ও এইচ টাইপের জরাজীর্ণ আবাসিক ভবনগুলো ভেঙে সেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সুউচ্চ ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদফতর কর্তৃক একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রধান স্থপতি কাজী গোলাম নাসির বলেন, শেরেবাংলা নগর এলাকায় দুটি জোন পেয়েছি। একটি তালতলা ও অন্যটি হলো ৪৩ একর জমি। তালতলা এলাকায় সিভিল এভিয়েশনের নিষেধাজ্ঞা নেই। এখানে বর্তমানে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৯৫০টি ইউনিট থেকে ১৫০০টি ইউনিট করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং ৪৩ একর জমিতে সর্বসাকুল্যে প্রায় এক হাজার ৮৫০ থেকে দুই হাজার পরিবার বসবাস করতে পারবে। এখানে ১০তলা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী শহরে ২১টি আবাসন প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার ৭০২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কৃষি খাতে

কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে আজ কৃষির প্রত্যেকটি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রত্যেকটি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হওয়ায় এখন এদেশের কৃষক কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নয় বরং পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেশ ক্রমে এগোচ্ছে। জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার সত্যিকার অর্থেই খাদ্য ঘাটতির দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত করেছে। ২১শে জুলাই কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি ইউনিয়ন পরিষদে সিআইবি ও নন সিআইবি কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, গত দশ বছর ধরে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সরকারের কৃষি ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন। এখন লক্ষ্য কৃষির আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, মার্কেটিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

সভায় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চাল রপ্তানির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে তাই রপ্তানির কথা মাথায় রেখে কৃষিপণ্য উৎপন্ন করতে হবে।

বরেন্দ্র এলাকায় ফসল উৎপাদন করতে হবে শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে

কৃষির জন্য বরেন্দ্র এলাকা একটা চ্যালেঞ্জ, তাই শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতে হবে। কৃষিতেই সমৃদ্ধ হচ্ছে এ অঞ্চলের অর্থনীতি। সংরক্ষণশীল কৃষি প্রযুক্তি এ অঞ্চলের কৃষিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ৬ই জুলাই রাজশাহীর বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)'র কনফারেন্স হলে আয়োজিত ২য় বরেন্দ্র এগ্রো-ইকো ইনোভেশন রিসার্চ প্লাটফর্ম কনফারেন্সে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ।

তিনি বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষিতে ফসলের বৈচিত্র্যকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজির আলোকে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং ফসল উৎপাদনে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিএমডিএ-কে অবদান রাখতে হবে।

রপ্তানি হচ্ছে খুলনার পান

আপ্যায়ন আতিথেয়তায় পানের জুড়ি নেই। অনেকেই আবার নিয়মিত পানের স্বাদ নেওয়ার অভ্যাসও গড়ে তুলেছেন। দেশের সীমানা পেরিয়ে এখন ভিনদেশিদের ঠোঁট রাঙাচ্ছে খুলনার পান। বর্তমানে খুলনা থেকে দুবাই, সৌদি আরব, কুয়েতসহ আরো অনেক দেশে পান রপ্তানি হচ্ছে। খুলনায় বিভিন্ন ফসল চাষের পাশাপাশি অর্থকরী ফসল হিসেবে পান চাষ অনেকটাই জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠেছে। খুলনায় ৭৯০ দশমিক ৩৫ হেক্টর জমিতে পান চাষ করা হয়। এ অঞ্চলে পান চাষির সংখ্যা পাঁচ হাজার ৫৬৩ জন।

সূত্র মতে, ঝাল-মিষ্টি পানের কারণে খুলনা অঞ্চলের পানের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। খুলনার রূপসা, দীঘলিয়া, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, দাকোপসহ আরো বেশ কিছু অঞ্চলে পান চাষ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে এ অঞ্চলে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পান চাষ হচ্ছে। খুলনায় যেসব পান চাষ করা হয় সেগুলো হলো– ঝালপান, বেনারসিপান, ছাঁচিপান, মিষ্টিপান, হাইব্রিডপান, মন্টুপান, বাবনাপান ও গেছোপান। একেক সিজনে দুই বিঘার বরজ থেকে প্রায় দুই থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত লাভ পাওয়া সম্ভব। তাই লাভ বেশি হওয়ায় দিন দিন এ অঞ্চলে পান চাষির সংখ্যা বাড়ছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

এ বছরেই শতভাগ বিদ্যুতায়ন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সারা দেশে এ বছরের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। বর্তমানে ৯৪ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। আগামী কোরবানির ঈদে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২৪শে জুলাই ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড-এর ৫৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন। বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে পিডিবি বোর্ডের সচিব সাইফুল ইসলাম আজাদ ও ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক চৌধুরী নাফিজ সরাফত, বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্মসচিব শেখ ফয়েজুল আমিন, পিজিসিবি'র সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আজাদ ও তিতাসের সচিব মাহমুদুর রব স্বাক্ষর করেন। ২২ বছর মেয়াদী এ চুক্তিতে গ্যাস থেকে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৩ দশমিক ৬৯২৩ সেন্ট, আর এলএনজি থেকে ৬ দশমিক ৮০৯৮ টাকা ট্যারিফ ধরা হয়েছে।

পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যন্ত্রাংশ টেস্টিংয়ে ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন চালু

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ টেস্টিংয়ের জন্য ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন চালু করেছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি(পিজিসিবি)। এখন থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মেশিনারিজ পরীক্ষা শুরু হবে। পিজিসিবি ১৩ই জুলাই পটুয়াখালী গ্রিড উপকেন্দ্র থেকে ১৩২ কেভি ভোল্টেজ দিয়ে নবনির্মিত লাইনটি চালু করা হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন করা যাবে। পিজিসিবি ৪৫ দশমিক ৬ কিলোমিটার লাইনটি ২০১৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর নির্মাণ কাজ শুরু করে। লাইনটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ২৫১ কোটি টাকা। এই লাইনটি ছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির জন্য একটি পৃথক সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করছে পিজিসি। লাইনটি পটুয়াখালী দিয়ে সরাসরি গোপালগঞ্জে বিদ্যুৎ আনা হবে। পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক শাহ আবদুল মাওলা বলেন, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক টেস্টিং শুরু হবে। এতে তিন মাস সময় প্রয়োজন,

আগামী ডিসেম্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালুর সময়সীমা ঠিক থাকছে। পটুয়াখালীর পায়রাতে এনডব্লিউপিজিসিএল এবং সিএমসি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করেছে। কেন্দ্রটির সকল যন্ত্রাংশ সংযোজনের জন্য এতদিন বিদ্যুতের জন্য টেস্টিং করা যাচ্ছিল না।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

১৫তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ২৬ ও ২৭শে জুলাই ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ ১ লাখ ৫২ হাজার প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৮ই মার্চ ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে এনটিআরসিএ। নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ২৬শে জুলাই সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত স্কুল ও স্কুল পর্যায়-২ এর লিখিত পরীক্ষা এবং ২৭শে জুলাই শনিবার ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কলেজ পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় ১০ই জুলাই ২০১৯ Dhaka Meeting of the Global Commission on Adaptation (GCA) শীর্ষক অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

এর আগে ১৯শে এপ্রিল ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমনারিতে ৮ লাখ ৭৬ হাজার ৩৩ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত ১৯শে মে ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজার পরীক্ষার্থী। পাসের হার ছিল ২০ দশমিক ৫৩ ভাগ। উত্তীর্ণদের মধ্যে স্কুল পর্যায়ের ৫৫ হাজার ৫৯৬ জন, স্কুল পর্যায়ের ২-এর ৪ হাজার ১২৯ জন এবং কলেজ পর্যায়ের ৯২ হাজার ২৭৫ জন প্রার্থী রয়েছেন।

ঈদুল আজহার আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর

ঈদুল আজহার আগেই গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান। ৮ই জুলাই ২০১৯ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটির ৪৩তম সভায় মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি এ আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী মাসের সম্ভাব্য ১২ তারিখে ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে শ্রমিকদের জুলাই মাসের বেতন-ভাতা এবং বোনাস দিতে হবে। এজন্য প্রতিমন্ত্রী কারখানা মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সজাগ হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

বর্তমান সরকার দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে চায়– প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে চায়। সে লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রবাসে গেলে নিজ পরিবারের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। ৬ই জুলাই ২০১৯ গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিশ্বজিত কুমার পালের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ফারুক আহমদ ও তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা কামরুল হাসানের যৌথ পরিচালনায় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদক: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু তহবিলের অর্থ ছাড়ে উদ্যোগী হতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তহবিলে অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, উদ্যোগী হতে উন্নত দেশ এবং দাতাসংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে আরো উদ্যোগী হওয়ারও আহ্বান করেন তিনি। মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিলদা সি হেইনি ৯ই জুলাই বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিযোজন নিয়ে মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ গত এক দশক ধরে প্রতিবছর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গড়ে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের কথাও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট বলেন, দুই দেশ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারে। হিলদা সি হেইনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশংসা করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেরা শিক্ষক

জলবায়ু পরিবর্তনের বিস্তৃতি এবং এর প্রভাব প্রশমনে নিজেদের সক্রিয় উদ্যোগ সম্পর্কে আরো সচেতন হতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, 'বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উদ্ভাবন ও অর্থায়নের যুগে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের অনেক সুযোগ রয়েছে যা সকলে সহজে কাজে লাগাতে পারি, গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন'র সহযোগিতায় আমরা জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সঠিক অভিযোজন কৌশলের পাশাপাশি সাশ্রয়ী পন্থা ও ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থার সুবিধা করতে চাই'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানে অনুষ্ঠেয় ক্লাইমেট চেঞ্জ সামিটের প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর জন্য। ঐ সম্মেলনে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহ ও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অভিযোজন

প্রক্রিয়ায় অগ্রগামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক অভিযোজন কেন্দ্র স্থাপনের দাবি রাখে। বিষয়টি বিবেচনা করতে আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি'।

১০ই জুলাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন (জিসিএ)-এর ঢাকা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট হিলদা সি হেইন, গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন-এর চেয়ারম্যান ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন এবং সম্মেলনের কো-চেয়ার এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. ক্রিস্টালিনা জার্জিওভা সম্মেলনে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সামনের সারিতে থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই ২০১৯ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী এসময় নেদারল্যান্ডের সহযোগিতায় প্রণীত শতবর্ষ মেয়াদি ডেল্টা প্ল্যানের কথা উল্লেখ করেন। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের সাফল্য তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেকের মতো আমরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। প্যারিস চুক্তি হচ্ছে এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর বৈশ্বিক চুক্তি'।

গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন'র চেয়ারম্যান ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও কৌশল সম্পর্কে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। বান কি মুন বলেন, আইপিসিসির রিপোর্ট অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার ফলে সমুদ্র লেভেলের পানির উচ্চতা থেকে এক মিটার বাড়ার ফলে বিশ্বের ১৭ শতাংশ এলাকা তলিয়ে যাবে। সে কারণে অভিযোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বান কি মুন আরো বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় অ্যাডাপটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা বলেছেন। আমরা তাঁর এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশই প্রথম দেশ ২০১৯ সালে অ্যাডাপটেশন নিয়ে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে'। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাবউদ্দিনও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দুর্ঘটনা রোধে ঢাকা-পাটুরিয়া সড়কে হবে পৃথক লেন

সরকার সড়ক দুর্ঘটনা রোধে লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঢাকা (মিরপুর) উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫), নবীনগর থেকে নয়াহাট ও পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ নামের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পটিসহ মোট ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প উপস্থাপন করা হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায়। ৯ই জুলাই শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা। চলতি বছর থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা-উথুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক। এ মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজারের অধিক হালকা ও ভারী যানবাহন চলাচল করে থাকে। তাই এই মহাসড়কে পণ্যবাহী যান চলাচল এবং সাধারণ জনগণের দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সরকার প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। একনেকে অন্য প্রকল্পগুলো হলো– বগুড়া-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, লাকসাম-বাইয়ারা বাজার-ওমরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, মর্ডানাইজেশন অব সিটি স্ট্রিট লাইট সিস্টেম অ্যাট ডিফারেন্ট এরিয়া আন্ডার চিটাগাং সিটি করপোরেশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজারের উন্নয়ন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৯টি ব্রিজ নির্মাণ।

মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তার নামকরণ

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী ২৮শে জুন পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার দেবোত্তর বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে দেশের এ পর্যন্ত নামহীন সকল রাস্তা, সেতু ও কালভার্টের নামকরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন রাস্তার নাম কোন কোন মুক্তিযোদ্ধাদের নামে করা যায় সে বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-বেনাপোল বিরতিহীন ট্রেন সার্ভিস

চালু হচ্ছে দ্রুতগতির বিরতিহীন আধুনিক ট্রেন 'বেনাপোল এক্সপ্রেস'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুলাই ভিডিও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৭ই জুলাই ২০১৯ বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে 'বেনাপোল এক্সপ্রেস' চালু এবং রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী রুটে 'বনলতা এক্সপ্রেস' ট্রেনের সেবা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

কনফারেন্সের মাধ্যমে বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে আন্তঃনগর 'বেনাপোল এক্সপ্রস' নামে নতুন এই ট্রেনের উদ্‌বোধন করেন। তিনি একইসাথে 'বনলতা এক্সপ্রেস' ট্রেনের রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ সেবাও উদ্‌বোধন করেন। দ্রুতগতির বিরতিহীন আধুনিক এ ট্রেন চালু হলে বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের নিরাপদ আসা-যাওয়া দ্রুততর ও আরামদায়ক হবে।

স্টেশন মাস্টার জানান, দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল থেকে ভারতে পশ্চিম বাংলার বনলতার দূরত্ব খুব কম এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে। এদের মধ্যে রোগীর সংখ্যা থাকে বেশি। এসব মানুষের যাতায়াতকে সহজ ও আরামদায়ক করতে বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল ট্রেন সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেয় রেল মন্ত্রণালয়।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের উপস্থিতিতে ১০ই জুলাই বনানীস্থ সেতু ভবনের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের নকশা রিভিউ এবং নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং Teenica Y Proyectos S.A (TYPSA) Spain with JV DOHWA & DDC. Bangladesh-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তিনশ চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশ নিরানব্বই টাকার চুক্তিপত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কাজী মোঃ ফেরদাউস ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান TYPSA-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Antorio Rodviguer Castellanos চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান, এয়ারপোর্ট থেকে আব্দুল্লাহপুর-বউর-বড়। আশুলিয়া-জিরাবো-বাইপাইল হয়ে ঢাকা ইপিজেড পর্যাপ্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা এবং জিওবি প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় আশুলিয়া এলাকার বিস্তীর্ণ হাওরের জলপ্রবাহ অবাধ রাখা, ঢাকা মহানগর গিয়ে সার্কুলার জলপথ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আশুলিয়ায় বিদ্যমান সড়ক বাঁধের পরিবর্তে প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চারলেন সেতু নির্মাণ করা হবে। এক্সপ্রেসওয়ের নিচ দিয়ে বিদ্যমান প্রায় ২৪ কিলোমিটার সড়ক চারলেনে উন্নীত করা হবে। নবীনগরে দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় এক কিলোমিটার। সড়কের দুপাশে প্রায় ১৮ কিলোমিটার ড্রেনেজ নির্মাণ করা হবে।

ঢাকা মহানগরীর সাথে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল ও ইপিজেডের যোগাযোগ সহজতর করতে বাংলাদেশ ও চীন সরকার জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। শীঘ্রই ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে এ বছরের ডিসেম্বরে প্রকল্পটির মূল কাজ শুরু হবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ডেঙ্গু সচেতনতা সৃষ্টিতে ডিসিসি'র কর্মসূচি

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে নগরবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে রাত-দিন কাজ করছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। কাঁঠালবাগান ঢাল থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসকরণ কাজ শুরু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। ২১শে জুলাই 'আতঙ্ক নয়, আসুন সবাই মিলে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করি' শীর্ষক এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন মেয়র সাঈদ খোকন। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা উত্তরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও মশক নিধন বিভাগের সবার ছুটি বাতিল করেছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম। ১৯শে জুলাই এডিস মশা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ডিএনসিসির আয়োজনে এক শোভাযাত্রায় অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ সর্বস্তরের জনগণ। এছাড়া দুই সিটি করপোরেশনেই মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে যারা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ পেতে এসএমএস-এর মাধ্যমে জনগণকে ফোন নম্বর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা শহরে হাসপাতাল হবে

দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে ক্যানসার ও কিডনি হাসপাতাল এবং জেলা শহরে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। ২১শে জুলাই মানিকগঞ্জের হিজুলী এলাকায় ৫০ শয্যার

ডায়াবেটিক হাসপাতাল উদ্‌বোধন শেষে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব কথা বলেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইসি বি-এর টিকা দিতে হবে

জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব শিশুকে হেপাটাইটিস বি-এর টিকা দিতে হবে। হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মায়ের শিশুকে ২৪ ঘণ্টা বা যত দ্রুত সম্ভব অবশ্যই ইমিউনোগ্লোবিউলিন টিকা দিতে হবে। আর কোনোভাবেই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। ২৫শে জুলাই প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত '২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে হেপাটাইটিস বি নির্মূলে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এসব কথা বলেন। ২৮শে জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসকে সামনে রেখে হেপাটোলজি সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এ বৈঠকের আয়োজন করে প্রথম আলো।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম ২৫শে জুলাই ২০১৯ মানিক মিয়া এভিনিউতে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ইয়াবা জীবন ধ্বংস করে

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ইয়াবা জীবন ধ্বংস করে দেয়। এ সকল অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে ফেলে নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। নতুন প্রজন্মকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের সবসময় সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। ২০শে জুলাই প্রতিমন্ত্রী ঢাকার মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে 'কামাল আহমেদ মজুমদার শিক্ষাবৃত্তি' প্রদানকালে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জীবনে বড়ো হতে হলে মাতা-পিতা আর শিক্ষকদের আদেশ মানতে হবে। মনোযোগ ও আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে– যা বছরের পর বছর অবহেলিত ছিল। তিনি বলেন, সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। ২০১৮-এর নির্বাচনি ইশতাহারে ঘোষিত অঙ্গীকারগুলো পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষকরা সশরীরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের খোঁজ নেওয়ায় পড়াশোনার মান ও পরীক্ষার ফলাফলে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। প্রতিবছর নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি আলহাজ মোঃ মইজউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ নূরে আলম।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শাস্ত্রীয় সংগীতে বর্ষা আবাহন

শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরে বর্ষাবন্দনা করেন শিল্পীরা। ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকার উদ্যোগে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে ২৬শে জুলাই ঢাকায় বসে দুই দিনের মালহার ফেস্টিভ্যাল। ভারত ও বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বনামধন্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। শাস্ত্রীয় সংগীতের এ আসরে ভারতের স্বনামধন্য ওস্তাদ ও শিল্পীরা গানে ও বাদনে বর্ষা আবাহন করেন। এ সময়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্লেকেন ও জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোলজ প্রমুখ। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীবা গাঙ্গুলী সবাইকে স্বাগত জানান।

শিল্পকলা পদক পেলেন সাত গুণী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রবর্তিত ২০১৮ সালের 'শিল্পকলা পদক' দেওয়া হয় সাত গুণীকে। এ বছর কণ্ঠসংগীতে গৌর গোপাল হালদার, যন্ত্রসংগীতে সুনীল চন্দ্র দাস, আবৃত্তিতে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যকলায় অল কেশ ঘোষ। লোক সংস্কৃতিতে মিনা বড়ুয়া এবং নাট্যকলায় ম হামিদ পুরস্কার পান।

নির্বাচিত গুণীদের প্রত্যেককে স্বর্ণপদক, এক লাখ টাকা ও সনদ দেওয়া হয়। ১৮ই জুলাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় মূল মিলনায়তনে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পদক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ১৮ই জুলাই ২০১৯ 'শিল্পকলা পদক-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

করেন ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

এক আয়োজনে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের জয়ন্তী

একই আয়োজনে স্মরণ করা হয় বাংলাসাহিত্যের তিন মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী। শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ২২শে জুলাই ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঋষিজের সভাপতি ফকির আলমগীর।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিত; যিনি মূলত জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তাঁর জীবনকে উৎকর্ষ করেছেন। বহুভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে ১৪ই জুলাই বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাগত বক্তৃতা করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ৯ই জুলাই ২০১৯ মহাখালীতে BRAC INN-এ 'প্রতিবন্ধী কর্মসংস্থান প্রকল্প'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭ ভাগেরও অধিক প্রতিবন্ধী

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭ ভাগেরও অধিক প্রতিবন্ধী। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে ১৬ লাখ ৬৫ হাজার ৭০৮ জন।

৯ই জুলাই সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ তথ্য উল্লেখ করে বলেন, এ বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এ জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করতে সরকার কাজ করছে।

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে সাইট সেভারস, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল ও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন আয়োজিত 'ইনক্লুশন ওয়ার্কস' শীর্ষক প্রকল্পের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, চলতি অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ৫ হাজার ৫২ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সব অসহায় মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে সরকার।

মন্ত্রী আরো জানান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অটিজম, শারীরিক, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা, দৃষ্টি, বাক, বুদ্ধি, শ্রবণ,

শ্রবণ-দৃষ্টি, সেরিব্রাল পালসি ও ডাউন সিনড্রোম ক্যাটাগরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে। ডেটাবেইস সফটওয়্যারে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। শনাক্তকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ল্যামিনেট পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হবে। সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পুরস্কৃত করা হলো ২৪ খুদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে

চন্দ্র জয়ের ৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০শে জুলাই বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর যৌথভাবে আয়োজন করে 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অলিম্পিয়াড ২০১৯'। সকাল ৯টায় সারা দেশের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের ২৫০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে শুরু হয় 'অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড ২০১৯'-এর কুইজ প্রতিযোগিতা। এরপর প্রতিযোগীদের হাতে বানানো রকেট মডেল প্রদর্শনী ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা, রকেট মডেল ও চিত্রাঙ্গন– এই তিন বিভাগ মিলে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে সেরা প্রতিযোগী বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত প্রতিযোগীদের মধ্যে সিনিয়র বিভাগে বিজয়ী হয় ৮ জন এবং জুনিয়র বিভাগে বিজয়ী হয় ১৬ জন।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও গলায় মেডেল পরিয়ে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার ও রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারের পরিচালক মি. ম্যাক্সিম। আয়োজকরা জানান, বিজয়ী ২৪ জনকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তুলতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে দুদিনব্যাপী কর্মশালা করা হবে। কর্মশালা থেকে নির্বাচিত সেরা ৫ জন রোমানিয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণে সুযোগ পাবে। সেইসঙ্গে সেরা দুজনকে রাশিয়ায় অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

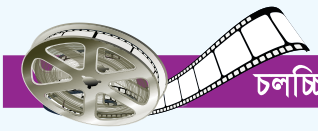

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বিল ২০১৯ সংসদে পাস

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জন্য দক্ষ, যোগ্য কলাকুশলী ও নির্মাতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় বিধান করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) বিল ২০১৯ সংসদে সংশোধিত আকারে পাস করা হয়েছে। ১১ই জুলাই, ২০১৯ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জাতীয় সংসদে বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন। বিলে বিদ্যমান আইনের ধারা ৬-এর ১ উপধারা দফা (ড)-এর পরিবর্তে নতুন (ড) দফা প্রতিস্থাপন করা হয়। নতুন দফায় ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডিতে ১ জন শিক্ষক ও ১ জন চলচ্চিত্র নির্মাতাসহ ন্যূনতম ৪-৬ জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বরেণ্য

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২২শে জুলাই ২০১৯ পাবলিক লাইব্রেরিতে পিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়। বিলটিতে গভর্নিং বোর্ডের সদস্যদের মেয়াদ ৩ বছরের পরিবর্তে ২ বছর করা হয়। এছাড়া বিলে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করার বিধান রাখা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত নয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান দেওয়া বিষয়ক সভায় কোন কোন চলচ্চিত্রের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে তা চূড়ান্ত করা হয়। ১৪ই মে অনুষ্ঠিত এক সভায় মোট নয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদানের জন্য তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত সাধারণ শাখায় মীর সাব্বিরের 'রাত জাগা ফুল', খান শরফুদ্দীন মোহাম্মদ আকরামের 'বিধবাদের কথা', কাজী মাসুদের 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', লাকী ইনামের '১৯৭১ সেই সব দিন', সারাহ বেগম কবরীর 'এই তুমি সেই তুমি' ও শমী কায়সারের 'স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা'। প্রামাণ্যচিত্র শাখায় হুমায়রা বিলকিসের 'বিলকিস এবং বিলকিস', পূরবী মতিনের 'মেলাঘর' এবং শিশুতোষ শাখায় আবু রায়হান মো. জুয়েলের 'নসু ডাকাত কুপোকাত'। এর মধ্যে সাধারণ শাখায় শমী কায়সারের 'স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা', মীর সাব্বিরের 'রাত জাগা ফুল', খান শরফুদ্দীন মোহাম্মদ আকরামের 'বিধবাদের কথা' এবং শিশুতোষ শাখায় আবু রায়হান মো. জুয়েলের 'নসু ডাকাত কুপোকাত' ছবির জন্য প্রত্যেক প্রযোজক ৬০ লাখ টাকা করে পেয়েছেন।

কাজী মাসুদের 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', লাকী ইনামের '১৯৭১ সেই সব দিন', সারাহ বেগম কবরীর 'এই তুমি সেই তুমি'– এই তিন প্রযোজক পেয়েছেন ৫০ লাখ টাকা করে। প্রামাণ্যচিত্র শাখায় দুটি চলচ্চিত্র বানাতে প্রত্যেক প্রযোজক পাবেন ৩০ লাখ টাকা করে।

এছাড়াও এ অর্থবছরে অনুদান পাওয়া পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হলো– জান্নাতুল ফেরদৌস আইভির 'খিজিরপুরের মেসি', জাহিদ সুলতান মিঠুর 'একাত্তর যাত্রা', মো. নাজমুল হাসানের 'রুপালি

কথা', ফারাশাত রিজওয়ানের 'শেকল ভাঙার গান' ও উজ্জ্বল কুমার মন্ডলের 'ময়না'– এ চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক ১০ লাখ টাকা করে পাবেন।

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'অর্জন-৭১'-এর শুভ মহরত অনুষ্ঠিত

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর গৌরবময় অবদান, কৃতিত্ব এবং ত্যাগের কথা নিয়ে নির্মিত হবে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'অর্জন-৭১'। ১৬ই জুলাই তেজগাঁওস্থ বিএফডিসি'র ৮নং ফ্লোরে এটিএন বাংলার স্টুডিওতে এ ছবিটির মহরত অনুষ্ঠিত হয়। মহরত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ আসাদুজ্জামান খান এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপি কমিশনার মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া।

সেন্সর পাস করল 'মায়াবতী' ও 'আব্বাস'

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেল দুই সিনেমা– 'আব্বাস' ও 'মায়াবতী'। 'মায়াবতী' চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন অরুণ চৌধুরী। ১৬ই জুন সেন্সর বোর্ড বিনা কর্তনে এ ছবিটিকে ছাড়পত্রের অনুমোদন দিয়েছে। এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রথম বড়ো পর্দায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন– নুসরাত ইমরোজ তিশা ও স্বপ্নজাল ছবির নায়ক ইযাশ রোহান। আরো অভিনয় করেছেন– রাইসুল ইসলাম আসাদ, মামুনুর রশীদ, দিলারা জামান, ফজলুর রহমান বাবু, আফরোজা বানু, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, আব্দুল্লাহ রানা, অরুণা বিশ্বাস, তানভীর হোসেন প্রবাল, আগুন প্রমুখ। এ চলচ্চিত্রটির কাহিনি– মায়া নামের এক কিশোরী ছোটোবেলায় তার মার কাছ থেকে চুরি হয়ে যায়। উইমেন ট্রাফিকিংয়ের ফাঁদে পড়ে সে। তাকে দৌলতদিয়ার রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করা হয়। সেখানে মায়াকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন সংগীতগুরু খোদা বক্স। এদিকে মায়ার গানের প্রেমে পড়েন একজন ব্যারিস্টার। এক সময় ভয়ংকর খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে মেয়েটি। শুরু হয় নতুন গল্প। নতুন সংগ্রাম।

অন্যদিকে পরিচালক সাইফ চন্দন 'আব্বাস' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। এতে অভিনয় করেন নিরব ও সোহানা সাবা। এ ছবির কাহিনি হলো– পুরান ঢাকায় 'আব্বাস' নামে এক ছেলের বেড়ে ওঠা ও সংগ্রামকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙামাটিতে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সমতলের তুলনায় পার্বত্য জেলাগুলোর মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন সেক্টরে এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই পশ্চাদপদ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের এগিয়ে নিতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন

দাতা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে সরকার ও দাতা সংস্থাদের ন্যায় আমাদের সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা এসব কথা বলেন।

২৪শে জুলাই জ্যানিডা অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর আওতায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ে সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা। অনুষ্ঠানে পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, ইউএনডিপির এই প্রকল্পটির মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে।

সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর আন্তরিকতায় বর্তমানে এখানকার কৃষক ও খামারিরা আধুনিক পদ্ধতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ফল-ফসল, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার উৎপাদিত ফল ও মাছ নিজ জেলার চাহিদা মিটিয়ে বাইরের জেলাতে রপ্তানি হচ্ছে। আর এগুলো সম্ভব হয়েছে কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতায়। এ পশ্চাদপদ এলাকার মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তনে কৃষি কর্মকর্তাদের সবসময় তাদের পাশে থেকে পরামর্শ প্রদান করার আহ্বান জানান চেয়ারম্যান।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ও এসআইপি সিএইচটি, ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি বিভাগের আহ্বায়ক ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য জ্ঞানেন্দ বিকাশ চাকমা।

রাঙামাটিতে ৭৩ বৌদ্ধ বিহারসহ চিকিৎসা সহায়তার অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ-এর বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ তহবিল থেকে রাঙামাটিতে ৭৩ বৌদ্ধ বিহারসহ অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৮ই জুলাই শহরের মৈত্রী বিহার দেশনালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব অনুদানের চেক বিতরণ করে, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের রাঙামাটি পার্বত্য জেলার ট্রাস্টি অফিস। অনুষ্ঠানে মোট ১৯ লাখ ১৮ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হেড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চিংকিউ রোয়াজা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট রাঙামাটি পার্বত্য জেলার ট্রাস্টি দীপক বিকাশ চাকমা।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এশিয়া-বিশ্ব একাদশ টি-২০

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ পালিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী। এই দিবসকে ঘিরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আগেই ঘোষণা দিয়েছিল বিশেষ কিছু করার। এবার জানা গেল, বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের মধ্যকার দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ২৪শে জুলাই তার পেশাগত কার্যালয় ধানমন্ডির বেক্সিমকো অফিসে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে সাকিব

আইসিসি মেন'স ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৯-এর সেরা একাদশ ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। গোটা আসরে ব্যাটে-বলে যারা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া সেরা ১১ ক্রিকেটারকে নিয়ে বানানো এই দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন।

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি'র মনোনীত পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি বেছে নিয়েছে বিশ্বকাপের সেরা দল। সেখানে সদস্য হিসেবে ছিলেন ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ, ইয়ান

স্মিথ ও ইশা গুহ এবং ক্রিকেট লেখক লরেন্স বুথ। কমিটির পঞ্চম সদস্য ও আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইসিসি'র ক্রিকেট বিষয়ক মহাব্যবস্থাপক জিওফ অ্যালারডাইস। সাকিব আল হাসান ৬০৬ রান (গড়ে ৮৬.৫৭) করেন ও ৩৬.২৭ গড়ে ১১ উইকেট নেন।

পয়েন্ট টেবিল

র‍্যাংক	দলের নাম	পয়েন্ট
১	ভারত	১২৩
২	ইংল্যান্ড	১২২
৩	নিউজিল্যান্ড	১১৬
৪	অস্ট্রেলিয়া	১১২
৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	১০৯
৬	পাকিস্তান	৯৪
৭	বাংলাদেশ	৯২
৮	শ্রীলংঙ্কা	৭৮
৯	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৭৮
১০	আফগানিস্তান	৬০

র‍্যাংকিংয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ

আইসিসি'র নতুন ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে এক ধাপ এগিয়েছে

জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু টাইগার যুবাদের

বাংলাদেশ। ২৫শে জুন প্রকাশিত র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সাতে। ১৪ই জুন প্রকাশিত ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল আটে। রেটিং পয়েন্ট ছিল ৮৫। বিশ্বকাপ শুরুর পর ঐ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচ খেলে ১টিতে জয় পেয়েছিল, হেরেছিল ১টিতে আর ১টি হয়েছিল ড্র। তবে এরপর ২৫শে জুনের মধ্যে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে ২টিতে। ফলে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২।

জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু টাইগার যুবাদের

ইংল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজে জয় দিয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ২৩শে জুলাই নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ৬ উইকেটের বড়ো ব্যবধানে হারিয়েছে টাইগার যুবারা।

উস্টারশায়ারে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২০০ রান করে ইংল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তৌহিদ হৃদয় ও শাহাদাৎ হোসাইনের অর্ধশতকে ১২ ওভার আর ৬ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় জুনিয়র টাইগাররা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএফপি'র কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর কর্মপরিকল্পনা-

পকেট পুস্তিকা তৈরি : 'বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানো'–শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি নিয়ে ২৫ হাজার কপি পকেট পুস্তিকা মুদ্রণ করা হবে।

সংকলন পুস্তিকা তৈরি : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রতিথযশা প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে ১০ হাজার কপি সংকলন গ্রন্থ মুদ্রণ করা হবে

সচিত্র বঙ্গবন্ধু : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর ২০০ পৃষ্ঠার 'সচিত্র বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে ১০ হাজার কপি পুস্তক মুদ্রণ করা হবে।

পোস্টার তৈরি : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ বিষয়ে ১০ লক্ষ কপি দুটি পৃথক পোস্টার, বিজি প্রেস থেকে মুদ্রণ করা হবে।

ছড়া/কবিতা সংকলন : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নিয়মিত সংখ্যা ছাড়াও সচিত্র বাংলাদেশ ও মাসিক নবারুণ পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা হিসেবে পূর্ববর্তী সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত ছড়া/কবিতা সংকলন করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ : 'বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু' শিরোনামে ২০ মিনিট ব্যাপী প্রামাণ্যচিত্রে বিশ্বের বড়ো নেতাদের মন্তব্য/বক্তব্য/অভিমত তুলে ধরা হবে। বিশ্বের বড়ো বড়ো কবিদের কবিতায় বঙ্গবন্ধু বিষয়টি তুলে ধরা হবে। ইংরেজি সাবটাইটেল/ধারা বর্ণনাসহ।

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ : 'শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে ৩-৫ মিনিট ব্যাপ্তির প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হবে।

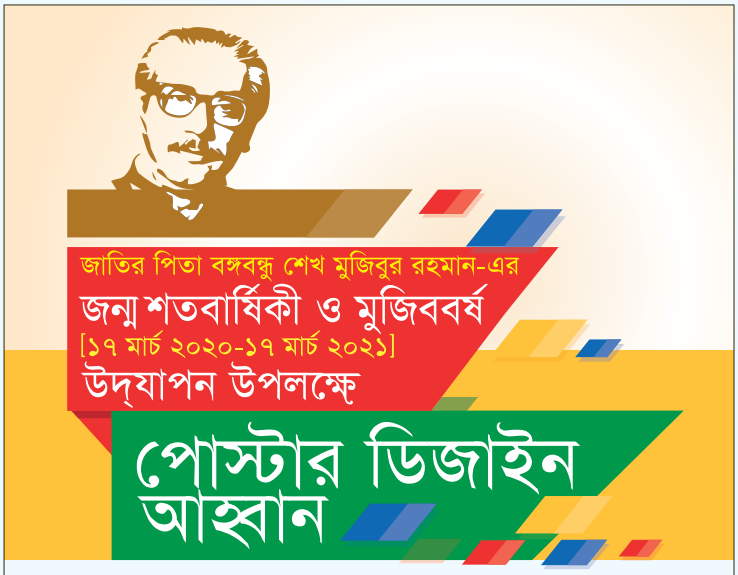

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষে আকর্ষণীয় বর্ণিল পোস্টার ডিজাইন আহ্বান করা যাচ্ছে। ৩০ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসরত আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের ডিজাইন পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডিজাইনে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ:

১. **পোস্টারের আকার:** ২০˝ x ৩০˝ / ২৩˝ x ৩৬˝
২. **স্লোগান:** পোস্টারে আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরি করে দেয়া যেতে পারে অথবা স্লোগান স্থাপনের জায়গা রেখে ডিজাইন করা যেতে পারে।
৩. **লোগো:** পোস্টারের ডিজাইনে মুজিব বর্ষের লোগোর জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।
৪. **পোস্টার:** 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী' উদ্‌যাপন এবং 'মুজিববর্ষ' [১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১] কথাগুলো থাকতে হবে।
৫. **সফটকপি:** Illustrator-6/EPS Outline AI File-এ প্রস্তুত করতে হবে।
৬. **পুরস্কার:** নির্বাচিত সেরা ৫ (পাঁচ)টি ডিজাইনের জন্য ডিজাইনারদের পুরস্কৃত করা হবে।
৭. **ই-মেইলে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:** mujib100posters@gmail.com
৮. **ডাকযোগে অথবা সরাসরি হার্ডকপি, সিডি, পেনড্রাইভে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:** মহাপরিচালক, **চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২-৮৩৩১০৩৪
৯. অমনোনীত ডিজাইন ফেরত দেওয়া হবে না।

মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক,সেগুনবাগিচা, ঢাকা